বাবরী মসজিদ

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

আব্দুস সামাদ চৌধুরী

ফোন ঃ-
বাড়ী ঃ- 0342 - 2713-253
কাছে থাকে ঃ- 9732048960
অফিস ঃ- 03523 - 277686

মূল্য-৩০ টাকা মাত্র

বাবরী মসজিদ

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত
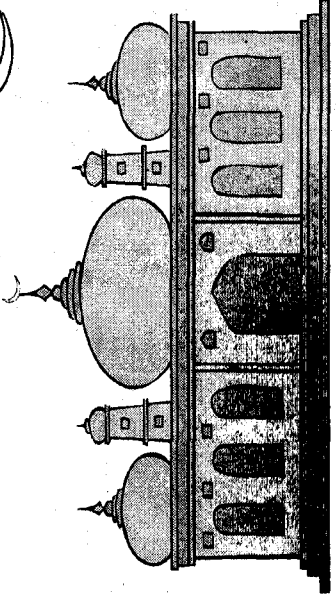
আবদুস সামাদ চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ইসলামিয়া লাইব্রেরী

৩৮ মদন মোহন বর্মন ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৭

ফোন- (০৩৩)২৩৩১৯৬৭

Contents

গ্রন্থকার-আবদুস সামাদ চৌধুরী, সাং ও পোঃ-রাইগ্রাম,জেলা- বর্ধমান

পথ নির্দেশ ঃ

কলকাতা, বারসাত এবং শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ হইতে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে বাসযোগে কৃষ্ণনগর অথবা লালগোলা —শিয়ালদহ ট্রেনে কৃষ্ণনগরে নেমে সেখান থেকে বাস যোগে নবদ্বীপ টাউন আসুন অথবা অথবা যে কোন দিক হইতে ট্রেনে বা বাসে বর্ধমান টাউন আসুন। নবদ্বীপ ও বর্ধমান হইতে নবদ্বীপ—বর্ধমান ভায়া নাদনঘাট, কুসুমগ্রাম লাইনের বাসে রাইগ্রাম আসুন।

জালসার দাওয়াতের জন্য

পঃ বঙ্গের মালদা, উঃ ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও বিহারের কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, পুর্ণিয়া, আরারিয়া ইত্যাদি জেলাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য যোগাযোগ কেন্দ্র—**মোঃ মুসলিম হোসেন, ব্রাদার্স প্রিণ্টিং প্রেস,** ***ইটাহার (উল্কা ক্লাবের পাশে) পোঃ ও থানা-ইটাহার, জেলা-উঃ দিনাজপুর,*** ৩৪ নং জাতীয় সড়কে মালদা ও রায়গঞ্জ মধ্যবর্তী ষ্টপেজ—ইটাহার। ফোন—(০৩৫২৩) ২৭৭৬৮৬

পঃ বঙ্গের অবশিষ্ট জেলাসহ সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব ভারতের জন্য যোগাযোগ কেন্দ্র ---**আবদুল্লা সাহেব,** (১নং বৃটিশ ইন্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা) গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের পূর্ব পাশে। ফোন—(০৩৩) ২৪২ ০৭৫০

পঃ বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূম জেলার জন্য শামসুল হক, আদর্শ বুক সেণ্টার, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, রুম নং—এ/১০, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

দেশের অবশিষ্ট অংশের জন্য অথবা দাওয়াত গ্রহন কেন্দ্রে ডেট না পেলে যোগাযোগ করুন-বাড়ীতে, প্রাথমিক যোগাযোগ ফোনে করতে পারবেন। ফোন-০৩৪২ / ২৭১৩-২৫৩ / ৯৭৩২০৪৮৯৬০

সাক্ষাতের জন্য বাড়ীতে আসুন প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবার। অবশ্যই আগে ফোন করবেন।

ফোন-০৩৪২ - ২৭১৩-২৫৩ / ৯৭৩২০৪৮৯৬০

Contents

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

০০০০০

Contents

অবতরণিকা

"মসজিদ আল্লাহর ঘর।" —আল হাদীস। আল্লাহর ঘরকে সুসংবৃত্ত করা, সচল রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব কার ? আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে বলেন, "মা কানা লিল্ মুশরিকিনা, আঁই ইয়া মুরু মাসাজিদাল্লাহ্।" আল্লাহর ঘর মসজিদকে সুসংবৃত্ত করা, আবাদ করা, হিফাজত করা, কাফির ও মুশরিকদের কাজ নয়। একাজ মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট। "বাবরী মসজিদ" হাদীসে উল্লেখিত আল্লাহর ঘর। কোরআনের নির্দেশ আনুসারে এর সার্বিক দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের উপর অর্পিত। সম্প্রতিকালে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার "বাবরী মসজিদ" কাহিনী পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত বর্ষের বিশ্ব-প্রশংসিত গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সাংসদ, গণতান্ত্রিক সরকার তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক , অর্থনৈতিক, বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক এক কথায় সার্বিক নীতি নির্দ্ধারণের তুরুপের তাস। দিল্লির মসনদই শুধু নয়, সারা ভারতবর্ষের ৩১টি অঙ্গ রাজ্যের প্রাদেশিক মসনদ এখন বাবরী মসজিদের দ্বরা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উলোট-পালট খায়। এই বাবরী মসজিদের পাশা খেলায় কে কত পটু ভারত বর্ষের রাজনীতিতে আজ তারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এমন ভড়ং যেন মনে হচ্ছে ভারত বর্ষের রাজনৈতিক নেতা নামক কিছু জোচ্চোর ব্যক্তির মৌলিক সমস্যা বাবরী মসজিদ। গুজরাতে অসংখ্য নিরীহ মুসলমানকে বর্ণনাতীত নির্মমতার ও নিষ্ঠুরতার শিকারে পরিণত করে হত্যা করা হয়েছে বাবরী মসজিদেরই জন্য। দেশের সাংসদ নির্বাচন আসন্ন। নির্লজ্জ নেতারা ভোটের অংক কষছেন বাবরী মসজিদের ফর্মুলায়। নির্বাচনের ফলও নির্দ্ধারিত হবে বাবরী মসজিদ কৌশলে কে কত সফল তার উপর ভিত্তি করেই। ভাবা যায়, ১০০ কোটী মানুষের দেশ এই ভারত বর্ষের সর্বময় কর্তা বা সম্রাটকে (প্রধানমন্ত্রী) বাবরী মসজিদের সিড়ি বেয়েই মসনদে উঠতে হবে। এই সেই বাবরী মসজিদ। যার উপর নির্ভর না করলে প্রধান মন্ত্রী

হওয়া যায় না, মন্ত্রী হওয়া যায় না, যায় না সাংসদ-বিধায়ক কিংবা পঞ্চায়েতের গম-চোর সদস্য পর্যন্ত হওয়া। এই বাবরী মসজিদের মালিক যারা সেই ভারতীয় মুসলমানরা (বিশেষ করে পঃ বাংলার মুসলমানরা) কিন্তু এই বাবরী মসজিদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং উদাসীন। আমি নিজে বিগত ১৫ বৎসর আগে পঃ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামী জলসায় বাবরী মসজিদ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে মুসলমান ভাইদের কাছ থেকেই বাধা প্রাপ্ত হয়েছি। আশার কথা এটাই আজ থেকে ১০/১৫ বছর আগের অবস্থার বদল হয়েছে। যারা এসব কথা বলতে বাধা দিতেন, আজ তাঁরাই এসব কথা শুনতে চা্ইছেন। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবসহ বহু পরিচিত জনেরা আমাকে বার বার বলেছেন ও বলছেন বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত পরস্পর বিরোধী তথ্যাদি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সুতরাং আপনি বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত তথ্য-দলিল ও প্রমান সাপেক্ষ সঠিক তথ্যাদি দিয়ে বাবরী মসজিদের উপর একখানা পুস্তক রচনা করুন। এই তাগাদার মর্যদা রক্ষা করতে এবং বাবরী মসজিদের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিল্লাতকে সঠিক তথ্যাদি জানিয়ে সজাগ করতে এই পুস্তকের অবতরণা। বাবরী মসজিদ স্থলে রাম মন্দিরের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে অযোধ্যার অবস্থান, বাবরী মসজিদের নির্মানকাল, নির্মানকারীসহ তথ্যভিত্তিক ঐতিহাসিক সত্য এবং ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র সম্পর্কিত রামায়নী তথ্যাদি ও বাবরী মসজিদ -রাম মন্দির বিতর্কে আদালতের মোকর্দমাসহ প্রত্নতাত্ত্বিক সত্য, যে সব বিষয় মসজিদ-মন্দির বিতর্কের প্রকৃত স্বরূপ মানুষের কাছে পরিস্কার করে দিতে পারে সেই সব বিষয়ে সাধ্যমত আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

মসজিদ-মন্দির বিতর্কে যারা পেশী শক্তির আস্ফালন করেন তাঁদের সুমতি হোক। যাঁরা দেশের হিন্দু-মুসলিম নেতাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে এই বিতর্কের নিরসন চান তাঁরা পাগল ছাড়া আর কি ? ১০০ কোটি মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষ। এই বিশাল দেশে কি সত্যিই এমন কোন হিন্দু বা মুসলিম নেতা আছেন যাঁদের প্রতিনিধিত্ব দেশের সব হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ মেনে নিবেন ? অথবা দেশে

Contents

কি এমন কোন হিন্দু বা মুসলিম নেতা আছেন যাঁরা দেশের সব হিন্দু মুসলিমের প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত দাবীদার ?

মসজিদ-মন্দির বিতর্ক অবসানের মসৃন পথ একটাই। সেটা হল আদালত। একমাত্র আদালতই পারে শান্তিপূর্ণভাবে এই বিতর্কের ইতি টানতে। পেশী শক্তি সমস্যা সমাধানের শেষ কথা হতে পারে না। নেতাদের আলোচনা প্রসূত সমাধান চিরস্থায়ী শান্তি এনে দিতে পারবেনা। আদালতের নিরপেক্ষ "রায়-ই" এক্ষেত্রে একমাত্র কাম্য। ভারতবাসী আদালতের রায়ের জন্য ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করুক। আদালতের নিরপেক্ষ আদেশ মাথা পেতে মেনে নেওয়ার জন্য তৈরী থাকুক। বিতর্কের অবসানের সাথে সাথে অশান্তি দূর হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে স্থায়ী শান্তি।

সম্রাট বাবর

বাবরী মসজিদ-রাম মন্দির বিতর্কের প্রথম এবং প্রধান সূত্র হল- যেহেতু সম্রাট বাবর সংশ্লিষ্ট স্থানে ত্রেতা যুগে নির্মিত রাম মন্দির ধ্বংস করে ইং ১৫২৮ খ্রীঃ বাবরী মসজিদ নির্মান করেছিলেন সেইহেতু বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে, ধ্বংস স্থলে রাম মন্দির তৈরী করা হোক। এই সূত্র যদি সত্য হয় তাহলে মসজিদ স্থলে মন্দিরের দাবী মানতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। এখন আমাদের দেখতে হয়—এই সূত্র কতটা সঠিক অথবা আদৌ সঠিক কিনা ? উল্লেখিত তথ্য অনুসারে সর্বপ্রথম যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল উঠবে তিনি হলেন সম্রাট বাবর। এই অধ্যায়ে আমরা সম্রাট বাবরের ইতিহাস মন্থন করে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচারে বসার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ।

একমাত্র রাম মন্দির ধ্বংসকারী হিসাবে অভিযুক্ত করে সম্রাট বাবরকে পরধর্ম বিদ্বেষী হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও সম্রাট বাবর পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন ইতিহাসে তার কোন প্রমাণ মেলে নাই।

ইতিহাসবিদ ডঃ ত্রিপাঠী মহাশয় বলেছেন—"সম্রাট বাবর অমুসলিমদের প্রতি ধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থায় ধর্মের কোন প্রভাব ছিল না। অধ্যাপক পি-মাইতি মহাশয়ের ভারত ইতিহাস পরিক্রমা পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় তাঁর প্রমাণ আছে।" ডঃ অমলেন্দু দে মহাশয় তাঁর ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা পুস্তকের ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"আঃ কুদ্দুস গাঙ্গোহি নামে একজন মুসলিম ধর্মগুরু সম্রাট বাবরকে পত্র লিখে শরিয়তি শাসন পরিচালনার উপদেশ দেন। বাবর তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য করেন। তিনি হিন্দু প্রজাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেন এবং হিন্দুদের সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে নিযুক্ত করেন।"

আজ দাবী উঠেছে রাম মন্দির ভেঙ্গে সম্রাট বাবর মসজিদ তৈরী করেন ১৫২৮ খ্রীঃ। আমরা জানি তুলসী দাস মহাশয় তাঁর "রাম চরিত মানস" রচনার সমাপ্তি করেন ১৫৭২ খ্রীঃ। অর্থাৎ ১৫২৮ খ্রীঃ থেকে মাত্র ৪৪ বৎসর পর। তুলসী দাস মহাশয় ছিলেন তখনকার দিনের একজন একনিষ্ঠ রামভক্ত সাধক। তাঁর সমসাময়িককালে কোন মুসলিম সম্রাট রাম মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মান করলে তিনি নিশ্চয়-ই তাঁর গ্রন্থে সে কথা লিখতে কৃপনতা করতেন না। তুলসী দাস রচিত রাম 'চরিত মানস' -এ সম্রাট বাবরের রাম মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মানের কোন উল্লেখ নাই। তাছাড়া তুলসী দাস মহাশয় তাঁর রাম চরিত মানস রচনা কররেন কাশী নগরীতে। যেটা অযোধ্যার খুব দূরে নয়। তাই সম্রাট বাবর কর্তৃক রাম মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মানের খবর তাঁর অজানা থাকবে একথা বিশ্বাস করা যায় না। রাম ভক্ত তুলসী দাস মহাশয় তাঁর রাম চরিত মানসে ম্লেচ্ছ যবনদের প্রভাব, মুসলিম রাজশক্তির উত্থান সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ চেপে না রাখলেও রাম মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মানের বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই কেন?

আসল কথা হলো সম্রাট বাবর নিঃসন্দেহে একজন অসাম্প্রদায়িক ও সর্ব ধর্ম সহিষ্ণু উদার প্রকৃতির সম্রাট ছিলেন। তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করতে না পারলে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মানের কাহিনী রচনা করা সম্ভব হবে না বলেই তাঁর চরিত্রে হিন্দু

বিদ্বেষের অপবাদ উত্থাপন করে —মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মানের কাহিনীর পালে হাওয়া লাগানো হয়েছে মাত্র। পরবর্তী অধ্যায়ে সম্রাট বাবরের উপর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মানের অপবাদ সৃষ্টির কাহিনী বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণের অপবাদ

অপবাদের শুরু ঃ- ১৯২১ সালে প্রথম মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মানের অপবাদ দেওয়া শুরু হয়। ১৯২১ সালে শ্রীমতী বেভ্যারিজ সম্রাট বাবরের তুর্কি ভাষায় লেখা আত্ম-জীবনী "বাবরনামা"র ইংরাজী অনুবাদ করেন। মূল পুস্তকের অনুবাদের শেষে শ্রীমতী তাঁর নিজস্ব মনগড়া এক পরিশিষ্ট সংযোজন করেন। সেখানে তিনি লেখেন —৯১৫ হিজরী সনে অর্থাৎ ইংরেজী ১৫২৮ খ্রীঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে সম্রাট বাবরের নির্দেশে তাঁর অনুগত অনুচর মীর বাকী একটিমসজিদ নির্মান করেন। মনে রাখবার মত কথা হল—এই পরিশিষ্টে কোন মন্দির ভাঙ্গার উল্লেখ নাই। শ্রীমতী বেভ্যারিজ তাঁর মসজিদ নির্মানের এই মিথ্যা কথাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফৈজাবাদ গেজেটিয়ার থেকে একটি উদ্ধৃতি দেন। উদ্ধৃতিটি হল এই রকম—মিঃ এইচ, আর, নেভিল ফৈজাবাদ গেজেটিয়ারে লেখেছেন- —"একটি মন্দির ধ্বংস করা হয়, এবং মসজিদ নির্মিত হয়।" মনে রাখতে হবে মিঃ নেভিলের এই উক্তির স্বপক্ষেও কোন তথ্য ছিল না।

আরও মনে রাখতে হবে যে, (ক) সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী বাবর নামায় কোন মসজিদ নির্মানের কথা বলা নেই। (খ) শ্রীমতী বেভ্যারিজ বাবর-নামার মুল অনুবাদে একথা লেখেন নাই। (গ) কোন ঐতিহাসিক সূত্র থেকেই মীর বাকীর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

অপবাদের বাড়াবাড়ি ঃ— "বাবরী মসজিদের একটি দেওয়াল চিত্রে দেখানো হয়েছে বাবরের সৈন্যগণ কল্পিত রাম মন্দির ধ্বংস করছে ও হিন্দু নিধন করছে। এই দেওয়াল চিত্রের সঙ্গে একটি লিখিত পরিচয় লিপিও দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, বাবরের সৈন্যরা অযোধ্যার রাম মন্দির আক্রমণ কালে ৭৫ হাজার হিন্দুকে হত্যা করে ও তাদের রক্ত বাড়ী তৈরীর মসলা হিসাবে ব্যবহার করে বাবরী মসজিদ নির্মান করে।"

"এই রকম উত্তেজক মিথ্যা সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ উস্কে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ছড়ানো হয়েছে। বাবর রাম মন্দির ধ্বংস তৎস্থলে বাবরী মসজিদ নির্মান করেন, এই ধারণার মতই ওই জাতীয় প্রচারও সমপরিমাণেই মিথ্যা।" —(তথ্য সূত্র কলকাতা বই-মেলা ২০০১ এ পরিবেশিত মাত্রা প্রকাশনা সংস্থার —রাম জন্মভূমি-বাবরী মসজিদ পুস্তক।)

অপবাদে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ঃ

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ভারত বর্ষের মানুষের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির করার পথ খুঁজতে থাকে। এই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের উলঙ্গ রূপ লক্ষ করা যায় বাবরি মসজিদ রাম মন্দির বিতর্ক সৃষ্টির মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মন্দির-মসজিদ বিতর্ককে কেন্দ্র করে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার প্রমাণ মেলে না। অপ্রীতিকর ঘটনা ও খুনোখুনি শুরু হয় ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে। ইং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার বেগমের সাথে চুক্তি অনুসারে ইংরেজরা অযোধ্যার রাজস্ব আদায় ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পায়। কিন্তু বিশেষ ঘটনাক্রমে মুসলমানেরা ইংরেজদের এলাকা ছাড়া করে দেয়। ঠিক এই সময় থেকে প্রতিশোধ মানসে ইংরেজরা অযোধ্যায় রাম মন্দির ভেঙ্গে বাবরী মসজিদ নির্মিত হয়েছে এই অপবাদ প্রচার প্রকাশ্যে শুরু করে দেয়। ইং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্টেগোমারি মার্টিন এই মুখে মুখে প্রচার করা কথা তাঁর সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন "জনশ্রুতি আছে যে, অযোধ্যায় রাম মন্দির ভেঙ্গে বাবরী মসজিদ

নির্মিত হয়। তবে আমি একথা বিশ্বাস করি না।'' (তথ্য সূত্র–দ্যা ডিসপিউটেড মস্ক-২৬ পৃঃ। লেখক শ্রী সুনীল শ্রীবাস্তব।)

এই রিপোর্ট পরবর্তী কালে ব্রিটেনের কেমব্রিজ ও অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে স্থান করে দেয় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। মনে রাখতে হবে যে ১৯৩৮ সালের আগের এই ঘটনার আগে পর্যন্ত কোন হিন্দু গ্রন্থেও রাম মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মানের কোন কল্প কাহিনী উল্লেখিত হয় নাই।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য ছিল অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহকে সিংহাসন চ্যুত করে অযোধ্যাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা। এই হীন সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নবাব ওয়াজেদ আলীর বিরুদ্ধে হিন্দু প্রজাদের উত্তেজিত করে তোলার প্রয়োজন অনুভব করল ইংরেজরা। কর্ণেল উইলিয়াম স্লিমার ও তাঁর অনুসারী জেমস্ আউট্রাম এই কাজে নিযুক্ত হলেন। এদের প্রত্যক্ষ মদতে হিন্দুরা মসজিদে মন্দিরের দাবী তুলে বসল। সত্য কথা বলতে হিন্দুদেরকে দিয়ে এই দাবী তোলানো হলো বা তুলতে প্ররোচনা দেওয়া হল। শুরু হল সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষই বাবরী মসজিদ - রাম মন্দির বিতর্কের প্রথম রক্ত ক্ষরণের সূত্রপাত। অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ এই দাঙ্গা নিপুনতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে দমন করলেও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ আইন শৃঙ্খলার অবনতির অজুহাত দেখিয়ে অযোধ্যাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত করে নেয়।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করে মনগড়া মন্দির-মসজিদ বিতর্ক সৃষ্টি করে অযোধ্যায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা লাগিয়ে অযোধ্যার দখলদারী কায়েম করার পর ইং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ফৈজাবাদের সেটেলমেন্ট অফিসার পি, কর্ণেগী তহশীলের নথি তৈরী করতে গিয়ে এক উদ্ভট মন্তব্য করে লিখলেন—''অযোধ্যা যেহেতু রামের জন্মস্থান, সেই হেতু সেখানে নিশ্চয়ই একটা রাম মন্দির থেকে থাকবে এবং আমার মনে হয় সম্রাট বাবরের নির্দেশেই ওই মন্দির ধ্বংস করা হয়।''

মনে রাখতে হবে–'আমার মনে হয়' এই সাম্রাজ্যবাদী উক্তিই অযোধ্যার রাম মন্দির ভেঙ্গে সম্রাট বাবর কর্তৃক বাবরী মসজিদ নির্মান করা হয়েছিল এই অপবাদ সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান দলিল।

আরো মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ইং ১৮৩৮ সালে মুখে মুখে প্রচার করে, ১৮৬১ সালে 'আমার মনে হয়' বলে লিখে, ও ১৯২১ সালে বাবর নামার অনুবাদের শীলমোহর লাগিয়ে বাবরী মসজিদ-রাম মন্দির বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ও এদেশে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতিতে ঘুণ ধরিয়ে দাঙ্গার দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছে সারা ভারত বর্ষে।

দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরেও তারা এই দাবানলে ঘৃতাহুতি দিয়ে চলেছে নিয়মিতভাবে। পেশী শক্তি নয়, নেতাদের আলোচনাও নয় আদালতের নিরপেক্ষ রায়-ই এই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মুলোৎপাটন করবে ইনশাআল্লাহ।

অযোধ্যা ঃ

বাবরি মসজিদ রাম মন্দির প্রসঙ্গ উঠলে স্বাভাবিকভাবে কয়েকটি নাম আলোচ্যসূচীতে এসে যায়। ১মতঃ, সম্রাট বাবর। ২য়তঃ, ভগবান রামচন্দ্র এবং অবশ্যই সেই সঙ্গে অযোধ্যা। উল্লেখিত বিতর্কের উৎসস্থল যেহেতু অযোধ্যা এবং অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র ছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র (যদিও অযোধ্যায় দশরথ নামে কোন রাজা ছিলেন না এবং রামচন্দ্র আদৌ রাজপুত্র ছিলেন না। এবিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা হবে।) এবং সেই রামের মন্দির ভেঙ্গে যেহেতু বাবরী মসজিদ নির্মিত হওয়ার কাল্পনিক গল্প চালু হয়েছে সুতরাং এই আলোচনায় 'অযোধ্যা' প্রসঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধ্যায়ে অযোধ্যার বর্তমান অবস্থান, পৌরানিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

অযোধ্যার বর্তমান অবস্থান ঃ- উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার সরযু নদীর তীরে অবস্থিত মসজিদ-মন্দির বিতর্কের কেন্দ্রস্থল এই অযোধ্যা। উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ থেকে তীর্থস্থান বারানসী যাবার পথ আছে ৩টি। রায় বেরেলী, আমেথী, প্রতাপগড় হয়ে একটি, সুলতানপুর হয়ে আর একটি। এবং বারাবাঙ্কি, ফৈজাবাদ,

অযোধ্যা হয়ে আর একটি। বারানসী থেকে দুন একস্‌প্রেস অথবা জম্মু তাওয়াই একস্‌প্রেসে চার ঘন্টার পথ এই অযোধ্যা। দাবী উঠেছে এই অযোধ্যায় অবস্থিত রাম মন্দির ভেঙ্গেই নাকি বাবরী মসজিদ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস বলে অন্য কথা। (১) আধুনিক কালের ২৫ জন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক যৌথ গবেষণার ভিত্তিতে জানাচ্ছেন যে, প্রাচীনকালে কৌশল রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল শ্রাবস্তী বা সাকেত, অযোধ্যা নয়। অযোধ্যা নামে যে জনপদের উল্লেখ রামায়ণে আছে তা গঙ্গাতীরে অবস্থিত অন্য কোন স্থান, সরযু নদীর তীরে অবস্থিত বর্তমানের অযোধ্যা নয়। (২) বাল্মীকি রামায়ণ অনুসারে ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র ত্রেতা যুগে আবির্ভুত হয়েছিলেন। আমরা জানি যুগ ৪টি ঃ (ক) সত্যযুগ, (খ) ত্রেতা যুগ, (গ) দ্বাপর যুগ ও (ঘ) কলি যুগ। কলি যুগ বা শেষ যুগ আরম্ভ হয় খ্রীষ্টের জন্মের ৩১০২ বছর আগে। তার আগে দ্বাপর, তার আগের যুগ হলো এই ত্রেতা যুগ বা রাম চন্দ্রের আবির্ভাবের যুগ। অর্থাৎ ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের জন্মকাল এখন থেকে বহু হাজার বছর আগের ঘটনা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই আজ থেকে মাত্র ১ হাজার বছর আগের হিন্দু পুরাণ গুলিতে কোশল রাজ্যের রাজধানী হিসাবে অযোধ্যার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তার আগে অযোধ্যার কোন উল্লেখ ছিল না। (৩) বাল্মিকির রামায়ণ রচিত হয়ে যাওয়ার অনেক পরে অযোধ্যাকে কোশল রাজ্যের রাজধানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (৪) বিশিষ্ট পর্যটক হিউয়েন সাং বলেছেন অযোধ্যা ছিল বৌদ্ধদের ধর্মচর্চার কেন্দ্র। হিন্দুদের নয়। (৫) জৈনদের প্রথম ও চতুর্থ তীর্থঙ্করের জন্মস্থান হিসাবে অযোধ্যার উল্লেখ আছে। রাম চন্দ্রের জন্মস্থান হিসাবে নেই। (৬) ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যাকে গোপতরু তীর্থের স্থান বলে উল্লেখ করা হলেও রাম তীর্থের স্থান বলে উল্লেখ করা হয় নি। (৭) আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় গবেষণা করে প্রমান করেছেন—রাম কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। এবং বর্তমান থাইল্যান্ডে (যা অতীতের শ্যাম দেশ নামে পরিচিত) আইয়ুথিয়া নামে এক নগরী ছিল। থাই ভাষায় আইয়ুথিয়ার সংস্কৃত অর্থ হল—অযোধ্যা। অর্থাৎ শ্যামদেশের অযোধ্যা বর্তমানের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার সরযু নদীর তীরে অবস্থিত নয়।

(৮) মাননীয় শ্রীযুক্ত সুশীল শ্রীবাস্তব মহাশয় তাঁর "দ্য ডিসপিউটেড মস্ক" পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীবি, বি, লাল যিনি পরবর্তীকালে বি-জে-পি দলে নাম লিখিয়েছেন তাঁর নের্তৃত্বে ১৯৭৫-৭৬ সালে আর্কোলজিওক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার পক্ষে বাবরী মসজিদের পিছনে প্রচুর মাটি খোঁড়াখুড়ি হয়। এই খোঁড়াখুঁড়ির রিপোর্টে প্রমানিত হয় খ্রীষ্টের জন্মের ৭০০ বছর পূর্বে অযোধ্যায় কোন জনবসতি ছিল না। সুতরাং উক্ত স্থানে ৫০০০ বছর আগে রামের জন্মানো অসম্ভব ব্যাপার।"

(৯) বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌতম রায় মহাশয় তাঁর হিন্দু সাম্প্রদায়িক মুসলিম মৌলবাদ পুস্তকে প্রমান করেছেন রাম চন্দ্রের জামানায় বর্তমানে অযোধ্যা নামক স্থানে জন বসতির অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল। তিনি তাঁর ঐ পুস্তকে আরও প্রমান করেছেন অযোধ্যায় যে সব রাম মন্দির নির্মিত হয়েছে তা অষ্টাদশ শতকের আগের নয়।

এই সব ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে খুব সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, (ক) বর্তমানের অযোধ্যা ও রাম চন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যা একই জায়গা নয়। (খ) রাম চন্দ্রের জামানায় যেহেতু বর্তমানের অযোধ্যায় জনবসতির প্রমান নেই সুতরাং বর্তমানের অযোধ্যা রামের জন্মস্থান হতে পারে না। (গ) বর্তমানের অযোধ্যায় আজ থেকে দুই শতাব্দী পূর্বে কোন রাম মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল না। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে ঃ

যে অযোধ্যায় দুই শতাব্দী পূর্বে রাম মন্দিরের কোন অস্তিত্ব ছিল না, সেই অযোধ্যায় পাঁচ শতাব্দী পূর্বে রাম মন্দির ভেঙ্গে তদস্থলে বাবরী মসজিদ নির্মিত হল কি করে ?

অযোধ্যা এবং রাম মন্দির প্রসঙ্গে এতক্ষণ ঐতিহাসিক তথ্য পর্য্যালোচনা করা হয়েছে। এবার আমরা অযোধ্যা ও রাম মন্দির বিষয়ে কিছু পৌরানিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করবো। এবং রাম মন্দির ভেঙ্গে বাবরী মসজিদ নির্মানের দাবীর সত্যাসত্য নিদ্ধারণে ব্রতী হব। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলি অযোধ্যা হিন্দুদের ধর্মস্থান এবং রাম চন্দ্র আরাধ্য দেবতা। তাই অযোধ্যা এবং রাম মন্দির সম্পূর্কে হিন্দু ভাইদের কোন না কোন ধর্ম শাস্ত্রে তথ্য থাকার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই

যে, (১) অযোধ্যাতে কস্মিনকালে কোন রাম মন্দির ছিল, হিন্দু ভাইদের কোন ধর্মগ্রন্থে সে কথার উল্লেখ নাই।

(২) স্বামী বিবেকানন্দ রাম চন্দ্রের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১১০ পৃষ্ঠায় স্বামীজির অভিমতে বলা হয়েছে—"পৌরানিক ভাগ বা দর্শনকে রূপদান। উহাতে সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষদের জীবনের উপাখ্যানাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলি সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষদের অল্প বিস্তর কাল্পনিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থূলভাবে বিবৃত হইয়াছে।" স্বামীজী আরো বলেছেন, "অলঙঘনীয় প্রামান্য গ্রন্থরূপে উহাকে (রামায়ণকে) মানিতে হইলে যে, রামের ন্যায় কেহ কখনো যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে তাহা নহে।"

সুতারাং পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও রাম চন্দ্র এক কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। এবং আদৌ রাম চন্দ্র বলে কেহ ছিলেন তাহা মান্য করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এরূপ একজন অস্তিত্বহীন ব্যক্তির জন্মস্থান, জন্মভূমি-মন্দির ইত্যাদির মনগড়া কত হাস্যকর ?

(৩) ১৫৭২ সালে রচিত তুলসীদাসী রামায়ণে প্রয়াগকে তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অযোধ্যাকে হিন্দুদের তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করা হয় নাই। এমন কি তুলসী দাসী রামায়ণে অযোধ্যায় কোন রাম মন্দিরের কথা বলা হয় নি।

(৪) ১৫৭২ সাল পর্যন্ত যখন পর্যন্ত তুলসী দাস তাঁর রামায়ণ রচনা শেষ করেন তখন পর্যন্ত অযোধ্যায় কোন রাম মন্দির ছিল না।

(৫) চারশত খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'বিষ্ণুস্মৃতি' গ্রন্থে যে হিন্দু তীর্থস্থানের তালিকা আছে সেখানেও অযোধ্যার কোন উল্লেখ নাই।

(৬) হিন্দুদের তীর্থস্থানের তালিকা সম্বলিত একখানি পুস্তক "তীর্থ চিন্তামনি" রচিত হয় ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে। রচনা করেন শ্রীযুক্ত বাচস্পতি মিশ্র। ঐ পুস্তকেও হিন্দুদের তীর্থস্থান হিসাবে অযোধ্যার কথা উল্লেখ করা হয় নাই।

(৭) ১৯৯৬ সালের ২১শে জানুয়ারী "ছাত্র সংহতি' পত্রিকায় লেখা হয়েছে—"ফাহিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইবন বতুতা প্রমুখ পর্যটকদের বিবরণীতেও অযোধ্যায় রাম মন্দিরের কোন উল্লেখ নাই।"

(৮) গোস্বামী তুলসী দাস মহাশয় ১৫৭২ সালে রাম চরিত মানস রচনা করার অনেক পর তুলসী দাসী রামায়ণ ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুলসী দাসী রামায়ণ ভক্তদের দ্বারা অযোধ্যার বিভিন্ন প্রান্তে ১৫-১৬টি রাম মন্দির নির্মিত হয়। ঐ ১৫-১৬টি রাম মন্দিরের পূজারী পুরোহিতরা সকলেই তাঁদের নিজ নিজ মন্দিরকে ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের প্রকৃত জন্মস্থান বলে দাবী করেন। এবং তাঁদের ভক্তবৃন্দ সে কথা বিশ্বাসও করেন।

এই অধ্যায়ের শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয় পৌঁছাতে পারি যে, বর্তমানের অযোধ্যা যা উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলায় অবস্থিত সেখানে পৌরাণিক দলিল ও প্রমাণ ভিত্তিক কোন রাম মন্দির ছিল না এবং থাকার কোন প্রকার সম্ভাবনাও ছিল না ও নেই। এবং অযোধ্যার রাম জন্মভূমি মন্দির ভেঙ্গে বাবরী মসজিদ নির্মিত হয়েছে এই গল্প ভিত্তিহীন হাস্যস্পদ ও মনগড়া দাবী মাত্র।

রামায়ণ ঃ

রাম মন্দিরের কথা উঠলেই রাম যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি রামায়ণও প্রাসঙ্গিক। কারণ রাম তো রামায়ণ নামক মহাকাব্যেরই এক নায়ক। সুতরাং রামমন্দির, ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই মহাকাব্য রামায়ণের প্রসঙ্গ এসে যাবে। তাই এই অধ্যায়ে রামায়ণ সম্পর্কে প্রিয় পাঠক বন্ধুদের কিছু জানিয়ে দিই। আমরা জানি মহামুণি বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করেন। কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণ করে অন্য কথা জানা যায়।

রামায়ণে চারটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে রামায়ণে মোট শ্লোক সংখ্যা ছিলমাত্র ৬০০০, দ্বিতীয় স্তরে এর শ্লোক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১২ হাজার এবং সর্বশেষ স্তরে দাঁড়ায় ২৪ হাজারে। মহামুনি বাল্মিকী প্রথম রামায়ণ রচনা করেন খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে বা তারও আগে। তখন প্রথম স্তরটি রচিত হলেও শেষ স্তরটি কিন্তু রচিত হয় বা

Contents

সংযোজিত হয় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ প্রথম স্তর থেকে ৪র্থ স্তর পর্যন্ত রামায়ণের সংযোজন কাল (৪০০+ ১২০০) ১৬০০ বৎসর। একটানা ১৬০০ বছর ধরে সংযোজন করেও বর্তমান উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম চন্দ্রের জন্মস্থান এবং জন্মস্থানে রাম চন্দ্রের কোন অস্তিত্ব বা প্রমাণ রামায়ণে সন্নিবেশিত করা যায় নি। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর রাম কথার প্রাক ইতিহাস নামক পুস্তকে রামায়ণ সম্পর্কে বলেছেন "বাল্মিকীর রামায়ণ রচনার পূর্বে দেশ বিদেশে অনেক 'রাম কথা' রচিত হয়েছিল। সেগুলিতেও দশরথ, রাম, সীতা, লক্ষ্মন, ভরত ইত্যাদি চরিত্র ও তাঁদের কাহিনীতে প্রাপ্ত তিনটি গল্প, জৈন সাহিত্যের একটি গল্প এবং ইরানীয় ঘোটনী ভাষায় রচিত একটি গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গল্পগুলি থেকে মহাঋষি বাল্মিকীর রামায়ণের কাহিনী সংগৃহীত।" সুতারাং রামায়ণ যে কোন ঐশ্বরিক গ্রন্থ নয় এবং গল্প থেকে তৈরী করা একটি মহাকাব্য মাত্র তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এবং কোন মহাকাব্য, কাব্য-নাটক-ড্রামার কোন চরিত্রকে যদি বাস্তব রূপ দানের চেষ্টা করা হয় সেটা দূর্ভাগ্য ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি ?

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি মাননীয় শ্রীগৌতম রায় মহাশয় তাঁর এক পুস্তকে লিখেছেন—"এইচ, ডি সাংকলিয়ার মত স্বনামধন্য প্রত্নতাত্ত্বিকও রামায়ণের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণের জন্য দেশ ব্যাপি কত খোঁড়াখুঁড়িই করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু প্রমাণ করা যায় নি। উল্টে যত গবেষণা হয়েছে, রাম কথার অনৈতিহাসিকত্ব ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

রামায়ণকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থ রূপদান করে এর নায়ক-নায়িকাদের বাস্তবতাকে প্রমাণ করার অপচেষ্টা কোন ভাবেই সফল হওয়ার কথা নয়। এবং হয়ও নি। সুতরাং যারা বলছেন, অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন, রাম চন্দ্র ছিলেন তাঁর পুত্র, রাম চন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যা নগরী এমন কি অযোধ্যার বাবরী মসজিদের মিম্বার স্থলটিই নাকি রাম চন্দ্রের ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান এবং ঐ স্থানেই এক রাম মন্দির ছিল, সম্রাট বাবর ঐ মন্দির ধ্বংস করেন ও তদস্থলে বাবরী মসজিদ নির্মাণ করেনইত্যাদি ইত্যাদি—। আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে

তাঁদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তাঁদের বক্তব্য ও দাবীর স্বপক্ষে তাঁদের হাতে কোন তথ্য, দলিল ও প্রমাণ থাকলে তা দিয়ে তাঁরা আমার যুক্তি খণ্ডন করুন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে নিয়ে, যার মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানানোর দাবী উঠেছে।

ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র

জানা যায় অনেক দিন আগে অযোধ্যা বলে এক জায়গায় রাম নামে এক ভীষণ হিংসুটে রাজা ছিলেন। শোনা যায় তিনি ছিলেন রাজা দশরথের পুত্র। একথা আদৌ সত্য নয়। রাম চন্দ্র রাজা দশরথের এক স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। কিন্তু রাজা দশরথ তাঁর পিতা ছিলেন না। নীচে এ বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

পিতৃ-পরিচয় ঃ- অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল ৩৫০ জন স্ত্রী। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর কোন সন্তান ছিল না। কারণ রাজা দশরথ ছিলেন নপুংশক বা হিজড়া। সৌভাগ্য বশতঃ সেকালে এই ধরণের সমস্যা সমাধানের এক প্রচলিত প্রথা চালু ছিল। প্রথাটা ছিল এই রকম যে , কোন পুরুষ নপুংসক বা হিজড়া হলে ঐ পুরুষের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাস করিয়ে গর্ভবতী করে নেওয়া হত। ঐ স্ত্রীর গর্ভের সন্তানের পিতা হয়ে যেতেন বেচেরা নপুংসক পুরুষটি। রাজা দশরথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ৩৫০ জন স্ত্রী থাকা সত্বেও রাজা দশরথের দ্বারা তাঁর স্ত্রীরা কেউ গর্ভবতী হতে পারলেন না। নিরাশ রাজা দশরথ তখন পুত্র কামনায় পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করলেন। এবং স্ত্রীদের গর্ভবতী করানোর জন্য ভাল পুরুষের সন্ধান করতে লাগলেন। তখনকার দিনে নপুংশক পুরুষের স্ত্রীদের গর্ভবতী করে দেওয়ার পেশায় ঋষ্যশৃঙ্গ নামে এক মুনি বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া ঐ ভাড়া করা পুরুষটি দেখতে ভাল না হলে অনেক সময় সমস্যা

Contents

দেখা দিত। স্ত্রীলোকেরা তাকে পছন্দ করতো না বা সহবাসে রাজী হত না। এক্ষেত্রে সে সমস্যা ছিল না, কারণ মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ দেখতে ভারী সুদর্শন ছিলেন, তাই মেয়েরা তাকে পছন্দ করতো। কম ঝামেলায় ভাল ফল পাওয়া যেত। রাজা দশরথের রাণীদের সন্তান সম্ভবা করার জন্য তাই মহাধুমধাম করে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে ডেকে আনা হয়েছিল। একজন স্ত্রীর উপর ভরসা করার ঝুঁকি না নিয়ে রাজা দশরথ তাঁর তিন প্রধানা রাণী কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রকে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গের অঙ্ক শায়িনী হতে আদেশ দিলেন। সুদর্শন ঋষ্যশৃঙ্গের সাথে সহবাসে রাণী কৌশল্যা গর্ভবতী হলেন। সেই গর্ভ থেকে চাঁদের াালোর মত রুপবান এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল। রাণী কৌশল্যার এই একমাত্র পুত্রই হল রামচন্দ্র। আল্লাহর ঘর বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে তদস্থলে এই ভগবান রাম চন্দ্রের মন্দির নির্মানেরই তোড়জোড় চলছে।

রাম চন্দ্রের বাল্যকাল ঃ— ভাগ্যের পরিহাসে রাজা হয়েও দশরথের পিতৃত্ব লাভ করতে অনেক বেশী বয়স হয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে পিতা হলে যা হয় রাজা দশরথের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হল না। রাজা দশরথ পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে পড়লেন। রামসহ তাঁর পুত্ররা স্পয়েল্ট বয় হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। যখন যা চায়, তখন তা পায়। শত অপকর্ম, কুকর্ম করেও রেহাই পেয়ে যায়। তার উপর রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাজ্যের লোক তাদেরকে সেলাম ঠুকতে লাগল। এতে করে রাম চন্দ্র নিজেকে দেবতা ভাবতে লাগলেন এবং তাঁর সাথী-সহচরেরাও তাঁকে সাক্ষাত দেবতা বলে তোষামোদ করতে শুরু করে দিল।

যৌবন কাল ঃ— বাল্য ও কৈশোরকাল বেশ আমেজের সঙ্গে কাটলেও যৌবনে পদার্পন করেই রাম চন্দ্র আত্মগ্লানিতে ভুগতে লাগলেন। অফুরন্ত ঐশর্য্যের মালিক, স্তাবক চাটুকার পরিবৃত্ত জীবন, তার উপর যুবরাজ। রামচন্দ্র ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করলেন। সাক্ষাত দেবতা তাঁর উপর রাজ কুমার বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু নারীকে খুশী করার আসল পরীক্ষায় তিনি যে অকৃতকার্য ! রাজা, রাজত্ব, রাজ সিংহাসন, ঐশর্যেব বলে, গায়ের জোরে মেয়েদের ধরে নিয়ে আসতেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজে মেয়েদের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে

পড়তেন। অপমানে, ঘৃণায় হীনমন্যতা তাকে গ্রাস করতে লাগল। দিনের পর দিন মন ছোট হয়ে যেতে লাগল।

গুণ্ডামীর শুরু ঃ— ছোট ভাই লক্ষনকে নিয়ে মানিক জোড় সেজে রাজ্যময় গুণ্ডামী, মারামারি করে বেড়াতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন রাম চন্দ্র। গুন্ডা হিসাবে রামের নাম বেশ প্রচার হয়ে গেল। পঞ্চবটি বনে ঋ যি বিশ্বমিত্রের কিছু শত্রু ছিল। মুনি বিশ্বমিত্র তাঁর শত্রুদের খতম করার জন্য রাম চন্দ্রকে ভাড়া করলেন। রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মনকে নিয়ে মুনি বিশ্বমিত্রের আশ্রম এলাকায় পৌছালেন। মুনি বিশ্বমিত্র অতিথিদের আহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। ঘটনাক্রমে তারকা নামের এক বনবাসী মেয়ে আশ্রম এলাকায় কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। রামচন্দ্র বনবাসিনী তারকার রূপ ও যৌবন দেখে মুগ্ধ হলেন। রূপমুগ্ধ রাম তারকাকে ধরতে গেলে তারকা প্রাণপনে বাধা দান করল। বনের মেয়ে তারকার কাছে বাধা পাওয়ার রাগে রাম চন্দ্র ভাই লক্ষনের সাহায্যে তার নাক মুখ ছুরীর আঘাতে জখম করে দিয়ে তাকে হত্যা করলেন। এটাই রাম চন্দ্রের জীবনের প্রথম খুন।মুনি বিশ্বমিত্র বললেন ঠিক করেছ। বনবাসী, আদিবাসী মেয়ে তো, ওকে হত্যা করায় কোন অপরাধ নেই। এরপর রামচন্দ্র যাদের মারার কনট্রাক্ নিয়েছিলেন তাদের শেষ করলেন। ইনিই ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র। আল্লাহর ঘর বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে ধ্বংসস্থলে যাঁর মন্দির নির্মানের তোড়জোড় চলছে।

বিবাহ ঃ— রাম-লক্ষন কর্তৃক বিশ্বমিত্রের কার্যসিদ্ধির ফলে বিশ্বমিত্র তাদের উপর অত্যন্ত খুশী হলেন এবং রাম লক্ষনকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন মিথিলায়। মিথিলার রাজা জনক তাদের আতিথ্যে বরণ করে নিলেন এবং তাঁর পারিবারিক আসবাব পত্র তাদেরকে দেখাতে লাগলেন। রাজা জনকের ঘরে বহুদিনের পুরাতন হরধনু নামে এক ধনুক ছিল। রামচন্দ্র সেই জীর্ণ ধনুকে তীর সংযোজন করতে গেলে সেটি ভেঙ্গে যায়। এদিকে রাজা জনক কৃষিক্ষেতে একটা মেয়েকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তিনি ঐ পালিতা কন্যার নাম দেন জানকী। জানকী তখন যৌবন প্রাপ্ত। রাজা জনক তার যুবতী পালিতা কন্যার বিবাহ দেবার চিন্তায় ছিলেন। ভাবলেন রামের সঙ্গে জানকির বিবাহ দিলে সুলভে

কন্যাদায় থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে। এছাড়া তার ভাইদের আরও তিন কন্যা ছিল। রাজা জনক স্থির করলেন একসাথেই চার কন্যার সস্তায় হিল্লে করে দিতে। মিথিলার চার বোনের সাথে আযোধ্যার চার ভাই-এর একই সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। রাজা জনকের কুড়িয়ে পাওয়া পালিতা কন্যা জানকী বোনেদের মধ্যে ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। যুবরাজ রাম চন্দ্রের সঙ্গেই রাজা জনক বিয়ে দিলেন জানকীর। এই সময় জানকীর নাম রাখা হল সীতা। পালক পিতা যুবরাজের সঙ্গে বিয়ে দিলেও জানকী জীবনে সুখী হয় নি কোন দিন। রাজনীতির কুচক্রে রাম-লক্ষ্মনের সাথে সীতাকে বনবাসে যেতে হল। সীতাকে সেখানে ভোর থেকে রাত অবধি ঘরের সব কাজ করতে হত। রাম-লক্ষ্মন দুই ভাই তাঁকে বাড়ীর সীমানার বাইরে বের হতে দিতেন না। শেষে একদিন সীতা লঙ্কাধিপতি রাবণের সাথে পালিয়ে গেলেন। রাবণের সাথে সীতার এই পলায়ণকেই রাবণের সীতা হরণ আখ্যা দেওয়া হয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে রাবণের সীতা হরণের ঘটনা আলোচিত হবে ইলশাআল্লাহ। যাই হোক রামচন্দ্র সীতাকে লঙ্কাপুরী থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। এই ঘটনাকেও সীতার উদ্ধার বলে চালনা হয়, এই প্রসঙ্গেও পরবর্তী অনুচ্ছেদে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। লঙ্কাধিপতি রাবন নিহত হওয়ার পর রাবনের বিশ্বাসঘাতক ভাই বিভীষণ লঙ্কার রাজা হয়ে বসলেন ও বন্দিনী সীতাকে রামের সামনে হাজির করলেন। রামের আদেশে সমস্ত রাজ্যবাসী ও আদিবাসী বাহিনীকে সেখানে জমায়েত করা হল এবং ভাই লক্ষ্মন এক চিতা তৈরী করলেন। সেই চিতার ধু-ধু আগুনে প্রকাশ্যে জন-সম্মুখে রাম চন্দ্র তাঁর সুন্দরী স্ত্রী সীতা দেবীকে পুড়িয়ে মারলেন। জনক রাজার পালিতা কন্যা সীতা স্বামী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের হাতে এইভাবে নিহত হলেন। এরপর রামচন্দ্রের ঘরে ফেরার পালা। লঙ্কা থেকে ফেরার পথে রাম চন্দ্র আর একটি স্ত্রীকে বিবাহ করলেন এবং তার ও নাম রাখলেন সীতা।

অযোধ্যায় ফিরে এসে কিছুদিন পর রাম চন্দ্র একদিন প্রমোদ কাননে দ্বিতীয় সীতাকে মাংস ও মদ খাওয়াতে খাওয়াতে লক্ষ্য করলেন, সীতা গর্ভবতী। নিজের হীনমন্যতার কারণে তিনি নিশ্চিত হলেন যে তিনি সীতার গর্ভের সন্তানের পিতা নন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাই লক্ষ্মনকে স্মরণ করলেন এবং আদেশ দিলেন এই রাতেই সীতাকে নদীর অন্যপারে

গভীর জঙ্গলে নির্বাসন দিয়ে আসতে। জন-মানবহীন গভীর অরণ্যে অনাহারে ও হিংস্র জন্তুর আক্রমনে দ্বিতীয় সীতার মৃত্যুই ছিল শ্রীরাম চন্দ্রের কাম্য।

কুলটা ভেবে ২য়া স্ত্রীকে জঙ্গলে নির্বাসন দেওয়ার পর শ্রীরাম চন্দ্র আর একটি সুন্দরী রমনীকে বিবাহ করলেন। এবং তারও নাম দিলেন সীতা। ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের মত রঘুপতির স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েও এই তৃতীয়া সীতা দেবীর কপালেও সুখ জোটে নি।

পৌরুষ লাভের আশায় রঘুপতি শ্রীরাম চন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞে উপস্থিত জনের সম্মুখে রাম চন্দ্র তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী সীতা দেবীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন করে বসলেন। তারপর শতশত দর্শকের সামনে ভূমি খনন করে তৃতীয়া স্ত্রী সীতাকে জীবন্ত কবর দিলেন।

একবার নয়, দুবার নয়, তিন তিনবার তিনজন সুন্দরী রমনীকে বিবাহ করে তিনজন স্ত্রীকেই এরূপ নৃশংস ভাবে খুন করলেন ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র। জয়-শ্রী-রাম।

সীতার পলায়ণ ঃ— কথিত আছে যে ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের স্ত্রী সীতা দেবীকে লঙ্কেশ্বর রাবণ ভিখারীর বেশে হরণ করে নিয়ে পালায়। লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের কাহিনী নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল। বনবাস কালে একদিন দন্ডকারণ্যে রাম-লক্ষন দুই ভাই মিলে এক বনবিহারিনী কন্যার পিছনে লাগলেন। আসলে ঐ কন্যার নাম ছিল সুর্পণখা। সে ছিল লঙ্কেশ্বর রাবনের বোন। ভগবান রাম চন্দ্ররা তা জানতে না পেরে দুই ভাই মিলে, কে তাকে আগে পাবেন তাই নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে লাগলেন এবং তাকে ধরতে চাইলেন। আক্রমনকারীদের হাত থেকে রেহাই পেতে রাবণ ভগিনী সুর্পণখা চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু আক্রমনের হাত থেকে অক্ষতভাবে রেহাই পেল না সুর্পণখা। লক্ষন তাকে আঘাত করে তার মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। রক্তাক্ত অবস্থায় আক্রান্ত সুর্পণখা দৌড়াতে দৌড়াতে পালিয়ে গেল। যথাসময়ে খবর পৌঁছিয়ে গেল লঙ্কাধিরাজ এবং সুর্পণখার সম্পর্কিত ভাই রাবনের কাছে। রাবন জানতে

পারলেন অযোধ্যার বিতাড়িত দুই রাজ কুমার রাম ও লক্ষন এই কাজ করেছে এবং তারা দন্ডকারন্যে মস্তানি করে বেড়াচ্ছে। ঘটনার সরজমিনে তদন্ত করতে লঙ্কেশ্বর রাবন পঞ্চবটী বনে এসে হাজির হলেন। বনে এসে লঙ্কেশ্বর রাম-লক্ষনকে সন্ধান করতে করতে এক কুটিরের সামনে এসে পৌঁচালেন। কুটিরের জানালা দিয়ে লক্ষ করলেন কুটির মধ্যে এক অপরূপা সুন্দরী যুবতী বধু সজলে নয়নে বসে আছে। সীতাকে এক পলক দেখে লঙ্কেশ্বর রাবন তার প্রেমে পড়ে গেলেন। লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন হে সুন্দরী! তোমার নিতম্ব বিশাল ও স্থুল, উরুদ্বয় হাতীর শুড়ের মত, তোমার দৃঢ় ও লোভজনক স্তন-যুগল উত্তম মনিময় আভরণে ভূষিত, তাদের মুখ পীনোন্নত, গঠন স্নিগ্ধ তাল ফলের তুল্য সুন্দর, হে কল্যানী তুমি কে ? দীর্ঘদেহী সুপুরুষ রাবণের মুখে এমন মধুর প্রেমালাপ শুনে সীতার হৃদয় ঝোড়ে হাওয়ার তরুর মত কেপেঁ উঠল। সীতার রাবণকে আসন ও জল দিলেন এবং নিজের পরিচয় বললেন। রাবণ ও সীতা গল্প করতে করতে দিন শেষ হবার উপক্রম। রাবণ লক্ষ করলেন সীতাও তার প্রতি আকৃষ্ট। রাবণ সীতাকে বললেন, সর্বাঙ্গ সুন্দরী, সর্বলোকো মনোহরা, তোমাকে আমি পেতে চাই, কিন্তু তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে আমি স্পর্শ করতে চাই না। এই বনবাসী বন্দী দশা থেকে পালিয়ে এসো, আমার প্রধানা মহিষী হও। আনন্দিত হৃদয়ে সীতা রাবনের প্রস্তাবে রাজী হলেন। প্রচারিত আছে রাবণের নাকি দশটি মাথা। আদৌ কি তাই ? আসলে তিনি এত জ্ঞানী ও বিচক্ষন রাজা যে লোকে বলত রাবনের যেন দশটি মাথা আছে। বুদ্ধিমান রাবন ও সীতা যুক্তি করলেন, আগামী কাল রাবণের মায়া মৃগের সাহায্যে সীতা, রাম ও লক্ষনকে দূরে পাঠিয়ে দিবেন। তখন রাবন সীতার কুটিরের পিছনে তাঁর রথ নিয়ে আসবেন আর দুজনে পালিয়ে যাবেন। যুক্তিমত পরের দিন রাবণ এক স্বর্ণলঙ্কার খচিত হরিণকে সীতার কুটিরের কাছে ছেড়ে দিলেন। সীতা দেবী রাম চন্দ্রকে ডেকে বললেন প্রাণনাথ ! দেখ কি অপূর্ব স্বর্ণালঙ্কার খচিত হরিণ। স্বর্ণালঙ্কার খচিত হরিণ দেখে রাম লোভ সামলাতে না পেরে তার পিছনে ছুটতে লাগলেন ধরার জন্য। যাবার সময় লক্ষনকে বলে গেলেন সীতাকে পাহারা দেবার জন্য। স্বামী রাম চন্দ্র হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে চলে যাবার একটু

পরেই সীতা দেবী লক্ষনকে বললেন আমি যেন রামের আর্তস্বর শুনলাম। তুমি এক্ষুনি তাকে সাহায্য করতে চলে যাও। লক্ষন কিন্তু যেতে রাজী নয়। আর লক্ষনকে যদি না সরানো যায় তাহলে রাবণ-সীতার সব চাল বানচাল হয়ে যাবে। সীতা দেবী লক্ষনকে বকলেন, বললেন তুমি যদি না যাও তাহলে তোমার দাদা আসলে আমে বলবো যে তুমি রামের বিপদ চাও এবং আমার প্রতি দুষ্ট অভিপ্রায়ে তুমি বনবাসে এসেছ। বৌদির মুখের এই কথা শুনে লক্ষন পড়লেন বিপাকে। বাধ্য হয়ে গজগজ করতে করতে লক্ষন রামের পশ্চাত অনুসরণ করলেন। যাবার সময় সীতাকে বলে গেলেন এই গন্ডী কেটে দিয়ে গেলাম এই গণ্ডীর বাইরে যাবে না। লক্ষন কুটির থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই চুক্তি মত লঙ্কেশ্বর রাবণের রথ এসে হাজির হল। মনের মানুষ রথে বসিয়ে আদর সোহাগে ভরিয়ে দিতে দিতে প্রাণের রাণীকে নিয়ে হাওয়া-হাওয়া। সীতা মুক্তির আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। তাদের উভয়ের পরস্পর আদর সোহাগের আতিশয্যে সীতার শরীর থেকে কিছু গহনা খুলে নীচে পড়ে গেল। এই হল লঙ্কেশ্বর রাবণের সীতা হরণের কাহিনী। এটা যদি ভিখারীর বেশে রাবন কর্তৃক সীতাকে হরণ করা হয়ে থাকে তাহলে এই ঘটনাকে সীতা হরণই বলতে হবে।

সীতার উদ্ধার —দীর্ঘদেহী, বীর, সুপুরুষ লঙ্কেশ্বর রাবনের সঙ্গে স্ত্রী সীতা দেবীর হাওয়া হাওয়া হয়ে যাওয়ার ঘটনা রামকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলে দিল। রাম চন্দ্র তাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে প্রেমিকসহ সীতাকে খুন করার শপথ নিলেন। রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাম চন্দ্র অরণ্যবাসী বিভিন্ন উপজাতি নেতাদের সাথে মহাজোট গড়ার চেষ্টা শুরু করলেন। কিস্কিন্ধার উপজাতিদের রাজা ছিলেন বালি। তার ভাই ছিলেন সুগ্রীব। সুগ্রীব ছিলেন সিংহাসনের জন্য লালায়িত। রাম চন্দ্র এই সুযোগ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। কিস্কিন্ধার রাজা বালিকে হত্যা করলেন। কিস্কিন্ধার রাজা হলেন বালির ভাই সিংহাসন লোভী সুগ্রীব। এখন সুগ্রীব রাম চন্দ্রের ঋণ শোধ করতে রাবনের বিরুদ্ধে রামের পক্ষে যোগ দিলেন। কিন্তু তাতে

কি প্রবল পরাক্রমশালী লঙ্কেশ্বরকে পরাজিত করে সীতা ও রাবনকে সাজা দেওয়া যাবে ? তাই রামচন্দ্র আর এক কৌশল খাটালেন। রাবণের ভাই বিভীষণও ছিলেন মসনদ লোভী। রামচন্দ্র তাকেও হাত করলেন। বিভীষণ দেখল রাবণ নিধন হলেই লঙ্কার সিংহাসন তাঁর। তাই তিনি রামের পক্ষে রাবণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সম্মত হলেন। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় পূজোর ঘরে রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে লক্ষ্মন হত্যা করলো। বীরকেশরী পুত্র মেঘনাদ খুন হওয়ায় রাবণ দূর্বল হয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও নিহত হলেন। বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে বসলেন। প্রেমিক রাবণের সাথে পালিয়ে আসা সীতাকে বন্দিনী অবস্থায় রামের সামনে হাজির করলেন। বলা হয় রামচন্দ্র নাকি বানর সেনা নিয়ে লঙ্কায় পৌঁছে যুদ্ধ জয় করে সীতাকে উদ্ধার করেন। আসল কথা তা নয়। অরণ্যে যে সব উপজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতো রামচন্দ্ররা তাদেরকে মানুষ মনে করতেন না। তাঁদেরকে রামচন্দ্ররা বানর ভাবতেন ও নিজেদের মধ্যে আলাপ চারিতার সময় বানর বলেই সম্ভাষণ করতেন। এইসব উপজাতি গোষ্ঠির নেতা বা রাজাদের নিয়ে মহাজোট গড়ে সুগ্রীব, বিভীষণদের সঙ্গে পেয়ে রামচন্দ্ররা রাবণকে বধ করে সীতা দেবীকে চির উদ্ধার করেন।

রামের সিংহাসন আরোহন ও লক্ষ্মনের পরিণাম ঃ

প্রথমা স্ত্রী জনকরাজ কন্যা সীতাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার পর ২য় বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে সদলবলে রামচন্দ্র অরণ্যবাসী সেনাদের সাহায্যে ভাই ভরতকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসে রামচন্দ্র চিন্তা করলেন যুদ্ধ বিজয়ী নায়ক হিসাবে আমার চেয়ে লক্ষ্মনের জনপ্রিয়তা বেশী হবার সম্ভাবনা প্রবল। তাই তিনি সারা জীবনের দুঃখ-সুখের সাথী ভাই লক্ষ্মনকে বাদ দিয়ে ভরতকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করলেন। ভাই লক্ষ্মনের অবস্থা হল চা-য়ের ভাঁড়ের মত। শুধু তাই নয়, রামচন্দ্র পরবর্তী সময়ে লক্ষ্মনকে সরযু নদীর তীরে বধ করতেও দ্বিধা করেন নি।

রামচন্দ্রের নারী ভক্তি ঃ- ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের নারী ভক্তির দু-একটি ঘটনা এই অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। সীতা দেবীর পলায়নের পর রামচন্দ্র একদিন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলছেন। যেতে যেতে এক জায়গায় অয়োমুখী নামে এক বনবাসী রমনীকে দেখতে পেলেন। তাঁকে রামচন্দ্র আক্রমণ করে তাঁর নাক, কান, স্তন পর্যন্ত কেটে দিলেন। এরপর একদিন রাম-লক্ষ্মন দুই ভাই পম্পার পশ্চিম তীরে এক আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেখানকার তপস্বী দের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করলেন। শবরী নামের এক নারী রামচন্দ্রের খুব ভক্তিভরে সেবাযত্ন করে ভাবলেন প্রাণ রক্ষা পাবে। কিন্তু না, সেবাযত্ন শেষ হওয়ার পরই তাঁকেও মরতে হল। এককথায় রামচন্দ্রের সঙ্গে যে মহিলারই একবার সাক্ষাৎ হয়েছে তাকে হয় মরতে হয়েছে নয়তো তরবারীর আঘাতে চিরদিনের মত পঙ্গু হতে হয়েছে। এই হল রঘুপতি রাঘব রাজা রামচন্দ্রের নারী ভক্তির নমুনা।

ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের মৃত্যু ঃ

পাঠক-পাঠিকা বন্ধুদের নিশ্চয় মনে আছে এই অধ্যায়ের প্রথমদিকে উল্লেখ করেছি ভগবান শ্রী রামচন্দ্র বিশ্বমিত্র মুনির আশ্রম এলাকায় এক বনবাসিনী যুবতী তারকাকে হত্যা করেছিলেন এবং এটাই ছিল তার জীবনের প্রথম নারী হত্যা। ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের রাম রাজত্বে নারী নির্যাতন, অরণ্যবাসীদের উপর অত্যাচার, পারিবারিক কলহ, ভ্রাতৃহত্যা, চক্রান্ত ও অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থানের জোরে অযোধ্যাবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। এহেন রামরাজত্বের অবসান কল্পে বিদ্রোহ হয় ধুমায়িত। রামচন্দ্র কর্তৃক নিহতা বনবাসিনী তারকার এক কন্যা ছিল তার নাম মায়াবতী। এই মায়াবতীর নেতৃত্বে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দাবানলের রূপ ধারণ করে। বনবাসিনী আদিবাসী কন্যা মায়াবতীর নারী বাহিনীর বিদ্রোহের চোটে রামচন্দ্র ক্ষমতাচ্যুত হন। তারকা কন্যা মায়াবতী তাঁর মায়ের নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নেন। সাঙ্গপাঙ্গ সমেত রামচন্দ্রকে কচুকাটা করে বিজয়নী মায়াবতী তাঁদের দেহ সরযু নদীতে ভাসিয়ে দেন। তারপর মায়াবতী বসেন সিংহাসনে। নিই হলেন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র। জয় শ্রীরাম ! জয় রাম মন্দির !!

প্রত্যক্ষ গণ্ডগোলের অবতারণা ঃ-

হাজার হাজার বছর আগেই ভগবান শ্রী রামচন্দ্র বনবাসিনী আদিবাসী রমনী মায়াবতীর হাতে রাজ্য, রাজসিংহাসনসহ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অলৌকিকভাবে ১৯৪৯ সালের একেবারে শেষদিকে হঠাৎ করে বাবরী মসজিদের ভিতর আবির্ভুত হয়ে গেলেন। প্রত্যক্ষ গণ্ডগোলের শুরু ঐ সময় থেকে। ১৯৮৭ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে আর, এস, এস, এর মুখপাত্র অর্গানাইজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছে— "১৯৪৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সকালে জন্মস্থানে অলৌকিকভাবে রাম ও সীতা দেবীর মূর্তি আবির্ভুত হয়।" পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে রামচন্দ্র জন্মস্থানে আবির্ভুত হলেন। এখন আমাদের প্রশ্ন ঃ

(ক) মহাকাব্যের কোন নায়কের জন্মস্থান বলে কিছু থাকে নাকি? (খ) আদৌ যার জন্মের কোন প্রমান ও সাল তারিখ পাওয়া যায় নাই তাঁর জন্ম এবং জন্মস্থানের দাবীর ভিত্তি কি ? (গ) মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, যাত্রা, গল্প ইত্যাদির কাল্পনিক নায়ক-নায়িকাদের জন্মস্থানের দাবী উঠতে শুরু করলে দক্ষযক্ষ বেঁধে যাবে না তো ? (ঘ) তাছাড়া তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় বাবরী মসজিদ ১৫২৮ সালেই নির্মিত হয়েছিল তাহলে ১৫২৮ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ৪২১ বছর তো বাবরী মসজিদের মধ্যে কোন মুর্তি ছিল না। হঠাৎ করে ১৯৪৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর রাম-সীতা আসলেন কোথা থেকে ? (ঙ) সীতীদেবীকে রামচন্দ্রের সহধর্মিনী বলা হয়। আমরা জানি রামচন্দ্রের স্ত্রী তিনজন এবং তিনজনের নামই সীতা। রামচন্দ্র তিনজন সীতাকেই সঙ্গে না নিয়ে একজন সীতাকে নিয়ে আবর্ভিুত হলেন কেন ? (চ) বাবরী মসজিদের ভিতর যে সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্র আবির্ভুত হলেন তিনি কোন সীতা ? ১ম, ২য় না ৩য়।

গণ্ডগোলের অগ্রগতি ঃ- ১৯৪৯ সালের ২শে ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় তৎকালীন জেলা শাসক কে, ডি, নায়ার উত্তর প্রদেশের তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, রাজ্যের মুখ্য সচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে এক বেতার বর্তায় জানান যে, ২২শে ডিসেম্বর রাত্রিতে যখন মসজিদ জনশূন্য ছিল, কয়েকজন হিন্দু তখন মসজিদে মুর্তি রেখে গেছে। রাতে যে ১৫জন পুলিশ পাহারাই ছিল তার

এই কাজে বাঁধা দেয় নাই। রাতের অন্ধকারে নির্জন মসজিদের মধ্যে মুর্তি রেখে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২৩শে ডিসেম্বর অযোধ্যা থানায় এফ, আই, আর করা হয়। এটাই বাবরী মসজিদ রাম জন্মভুমি গণ্ডগোলের প্রথম মোকর্দমা।

মসজিদে মূর্তি ঢোকান কে ? ১৯৪৯ সালে উত্তর প্রদেশে ফৈজাবাদের জেলা শাসক ছিলেন কে, ডি, নায়ার। তিনিই রাতের অন্ধকারে বাবরী মসজিদের মধ্যে চুপিসারে একটা রামের মুর্তি রেখে আসেন। পরে অবশ্য এই ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। ভাবতেও অবাক লাগে ঘটনার নায়ক জেলা শাসক মিঃ কে ডি নায়ার মহাশয়ই রাত্রে মসজিদের মধ্যে মূর্তি রেখে এসে ২৩শে ডিসেম্বর সকালে উপরে বর্ণিত বেতার বার্তা পাঠান মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্য সচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে। কি অদ্ভুত আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র।

অন্য সূত্র থেকে জানা যায় বাবরী মসজিদের মধ্যে রামের মুর্তি ঢোকানোর ঘটনাটা একটু ভিন্ন রকম। তবে বাবরী মসজিদের মধ্যে রামের মুর্তি ঢোকানোর মূল পাণ্ডা কিন্তু জেলা শাসক কে ডি নায়ারই। রাম জন্মভূমি মন্দির গড়ার নেশায় এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আমলা মাতাল হয়ে উঠেছিলেন। রাম জন্মভূমি মন্দির গড়ার স্বপ্নে বিভোর জেলা শাসক মিঃ নায়ার এই মহৎ কাজ করার জন্য বাছাই করেছিলেন দিগম্বর আখড়ার এক সক্রিয় তরুণ সন্ন্যাসীকে। তাঁর নাম মহন্ত পরম হংস রামচন্দ্র দাস। (এই অনুচ্ছেদের পরপরই এই রামচন্দ্র পরম হংসের ও মিঃ নায়ারের পরিচয় বর্ণনা করা হবে।) গভীর রাতে জন মানব শুন্য মসজিদের মধ্যে এই রামচন্দ্র পরম হংসই রেখে আসেন রামলালার মূর্তি। জেলা শাসক মিঃ নায়ারের চাপে বাবরী মসজিদের পাহারায় থাকা পুলিশ অফিসার মাতাপ্রসাদ চুরি করে রাতের অন্ধকারে নির্জন মসজিদের ভিতরে রাম মূর্তি রেখে আসার ঘটনাকে অলৌকিক রূপদান করেন। জেলা শাসক মিঃ নায়ারের চাপে ও পরামর্শে মাতাপ্রসাদ বলেন, আকাশ পথে আলোর ঝর্ণাধারায় নেমে আসে রাম লালার মূর্তি। এবং মসজিদের ছাদ ভেদ করে মসজিদের ভিতরে ঢুকে পড়ে। সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দুত্ব বাদীরা একথা প্রচার করতে শুরু করে। ভাবা যায় কি নির্ভেজাল মিথ্যা এবং অসম্ভব কথা। বহু হাজার বছর আগে যে

ভগবান শ্রী রামচন্দ্র এক আদিবাসী মহিলার হাতে নিহত হলেন, সেই ভগবান রামচন্দ্র ছাদ ফুঁড়ে মসজিদে ঢুকে পড়লেন। যে ভগবান রাম একটা আদিবাসী মহিলার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে অক্ষম সেই ভগবান রাম ছাদ ফুটো করে মসজিদে ঢোকার শক্তি পেলেন কোথা থেকে ? আল্লাহ্ মানুষকে সঠিক বিষয় বোঝার ক্ষমতা দান করুন। এখন আলোচনা করব কে এই কে ডি নায়ার ও মহন্ত রামচন্দ্র পরম হংস দাস।

কে, ডি, নায়ার ঃ- উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার তৎকালীন জেলা শাসক ছিলেন এই কে ডি নায়ার। বাবরী মসজিদের মধ্যে রাম লালার মূর্তি ঢুকিয়ে দেওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন সরকারী চেয়ারে বসে চোরের মত লুকিয়ে মসজিদের মধ্যে মূর্তি রাখা সম্ভব হলেও মসজিদের স্থানে মন্দির বানানো সহজ হবে না। তাই তিনি বৃহৎ উদ্দেশ্যে জেলা শাসকের চাকরী ত্যাগ করলেন এবং হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। তার কিছু পরেই তিনি জনসংঘ দলে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি ফৈজাবাদ কেন্দ্র থেকে জনসংঘের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে লড়েন।

মহন্ত রামচন্দ্র পরম হংস ঃ- গভীর রাতে জনমানবহীন বাবরী মসজিদের মধ্যে ১৯৪৯ সালের ২২শে নভেম্বর গোপনে রাম লালার মূর্তি ঢোকানোর মূল নায়ক মিঃ কে, ডি নায়ারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর ঐ কাণ্ডের ২য় নায়কের পরিচয় এখানে তুলে ধরছি। মহন্ত রামচন্দ্র পরম হংসের আসল নাম ছিল চন্দ্রেশ্বর ত্রিপাঠী। তাঁর জন্মস্থান ও বাসস্থান হল বিহারের ছাপরা জেলার অন্তর্গত সিংখিনপুর গ্রাম। চন্দ্রেশ্বর ছাত্র জীবনে পড়তে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হয় কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে। তখন থেকেই তাঁর হিন্দুত্বের রাজনীতিতে হাতে খড়ি। কলকাতায় তিনি হিন্দু মহাসভার সদস্য হন। তখনকার দিনের হিন্দু মহাসভার নরম হিন্দুত্ব তাঁকে খুব আকৃষ্ট করতে পারে নি। কলেজের পড়াশোনার পাট চুকিয়ে তিনি চলে যান হুগলী জেলার উত্তর পাড়ায় মাখাল আশ্রমে। সেখান থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চলে যান অযোধ্যা। অযোধ্যা পৌঁছানোর পর তিনি বাবরী মসজিদ স্থলে রাম

মন্দির নির্মানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই লক্ষকে সফল করার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে মসজিদের মধ্যে রাম লালার মূর্তি ঢুকিয়ে রেখে আসেন ও নানা রকম গাঁজাখুরি আজগুবি প্রচার করে চলেন। তিনি ছিলেন অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি আন্দোলনের প্রথম সারির এবং অবিংসবাদী নেতা। গোপনে চোরের বেশে মসজিদের মধ্যে রামলালার মূর্তি ঢুকিয়ে দেওয়ার পরপরই তিনি মজজিদের মধ্যে রাম লালার পূজার্চনার অনুমতি প্রার্থনা করে ফৈজাবাদ আদালতে মোকর্দমা রুজু করেন। মন্দির-মসজিদ বিতর্কের মোকর্দমাগুলির মধ্যে মন্দিরপন্থীদের পক্ষ থেকে এটাই প্রথম মোকর্দমা। ২০০৩ সালের ৩০শে জুলাই ৯৩ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। দেশ, দশ ও জনগনের কোন সেবামূলক কাজে নয় একমাত্র মসজিদ স্থলে মন্দির নির্মানের পরিকল্পনা আর রাম সেবা যাঁর জীবনের একমাত্র কর্ম ছিল তাঁর শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে আমাদের প্রধান মন্ত্রী, উপ-প্রধান মন্ত্রীসহ সরকারের পদস্থ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি আমাদের তাজ্জব বানিয়ে দেয়।

প্রত্নতাত্বিক বিশ্লেষণ ঃ মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নয়

অযোধ্যায় মন্দির মসজিদ বিতর্কে প্রত্নতাত্বিক তথ্য প্রমানও একটা উজ্জ্বল নির্দেশিকা দিতে পারে আমাদের সামনে। বিতর্ক সৃষ্টির পর থেকে বহু সময়ে বহুবার বিভিন্ন প্রত্নতাত্বিক গবেষক এবিষয়ে তাদের গবেষণা লব্ধ সিদ্ধান্ত জানাতে কৃপনতা করেন নি। অযোধ্যার বাবরী মসজিদ এবং সংলগ্ন জায়গায় খনন কার্য চালিয়ে বিগত কাল থেকে এযাবৎ যত প্রত্নতাত্বিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কখনওবাবরী মসজিদ স্থলে রাম মন্দিরের কোন গন্ধ পাওয়া যায় নি। হঠাৎ করে গুজরাটে মুসলিম নিধন যজ্ঞের পর মহামান্য এলাহাবাদ হাই কোর্টের লখনউ বেঞ্চের নির্দেশে বাবরী মসজিদের নীচে খনন কার্য চালিয়ে আদালত নিযুক্ত প্রত্নতাত্বিকরা যে রিপোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চের বিচারপতিদের হাতে তুলে দিয়েছেন তা অতীতের সমস্ত রিপোর্টের সম্পূর্ণ বিপরীতএবং পরস্পর বিরোধী ও অসম্পূর্ণ। শুধু তাই-ই নয় এই রিপোর্ট নিরপেক্ষ জন-মানসে গভীর উৎকণ্ঠা ও

সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। এই প্রত্নতাত্বিক রিপোর্টটি গত ইং ২৫-৮-০৩ তারিখে এলাহাবাদ হাই কোর্টের লখনউ বেঞ্চের বিচারপতিদের সামনে খোলা হয়। লিখিত মতামত সহ বহু মানচিত্র ও নকশা ঐ রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্য হওয়ার বিষয় এটাই যে এযাবৎ কাল বহুবার খনন কার্য চালিয়ে যে বাবরী মসজিদের নীচে কোন রাম মন্দিরের কোন রকম নিদর্শন পাওয়া যায় নি, হঠাৎ করে এই রিপোর্টে সেই মসজিদের ঠিক নীচেতেই এবং ৫০ মিটার নীচে মন্দিরের একটা বিশাল কাঠামোর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এবং আরো আশ্চর্য হওয়ার মত কথা, ঐ মন্দির কাঠামোটিতে ১০০০ সাল থেকে ১৫২৮ সাল অর্থাৎ মসজিদ নির্মান কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মন্দিরের নির্মান কাজ চলারও প্রমান নাকি মিলেছে। মাটি খুঁড়ে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে রিপোর্টে দাবী করা হয়েছে তার মধ্যে আছে পাথর ও নকসা করা ইঁট, মিথুন মূর্তি, পাতার নকসা, কালো পাথরের ভাঙ্গা আটকোণ বিশিষ্ট স্তম্ভ, বিজেপি-র নির্বাচনী প্রতীক পদ্মফুলের মোটিভ, জলের ফোয়ারা এবং কমপক্ষে ৫০ টি পিলারের ভিত। মন্দিরের যে কাঠামোর সন্ধান পাওয়া গেছে বলে দাবী করা হয়েছে, সেটি উত্তর দক্ষিণে লম্বায় ১৫০ ফুটের বেশী এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে প্রায় ১০০ ফুট মতো। ঐ রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে মাটির নীচে ঐ কাঠামোটির কেন্দ্র বিন্দুর ঠিক উপরেই ছিল মূল মসজিদ গৃহটি। বর্তমানে ঠিক ঐ কেন্দ্র-বিন্দুতেই রাখা আছে রাম লালার মূর্তি। মজার কথা হল ঃ

(১) ঐ রিপোর্টে পুনরায় বলা হয়েছে শুরু থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত যে সব কাঠামোর নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলির চরিত্র এবং ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এই ব্যাপারে ধারণাকে সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত করার মত কোন প্রমান হাতে পাওয়া যায় নাই।
(২) আজ থেকে প্রায় ৩ হাজার বছর আগে ঐ জায়গা যাদের দখলে ছিল তারা কালো পালিশ করা মাটির বাসন-পত্র ব্যবহার করতো, কিন্তু সেই সময়ের কোন কাঠামো তৈরীর নিদর্শন ঐ স্থানে পাওয়া যায় নি।
(৩) ১১০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে ঐ স্থানে উত্তর -দক্ষিন ১৫০ ফুটের বেশী লম্বা একটি কাঠামো গড়ে উঠলেও ঐ কাঠামো খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই এবং ঐ কাঠামোটি তিন তলা বিশিস্ট ছিল। রিপোর্টের শেষে বলা

হয়েছে ১৫০০ খ্রীঃ পর সরাসরি এই কাঠামোটির উপরেই বাবরী মসজিদটি নির্মান করা হয়েছিল।

এই প্রত্নতাত্বিক রিপোর্ট সম্পর্কে সুন্নী সেণ্টাল ওয়াকফ বোর্ডের আইনজীবি জনাব জাফারিয়ার জিলানী সাহেব বলেন, "রিপোর্টটি অস্পষ্ট এবং স্ববিরোধী"। তিনি আরো বলেন—রাজনৈতিক চাপের মুখে এই রকম রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে।

উল্লেখিত রিপোটটি দেখে যে কোন মানুষই এডভোকেট জিলানী সাহেবের সঙ্গে এখমত হতে বাধ্য হবেন। কারণ ঃ (ক) রিপোর্টটিতে কোন কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। (খ) ঐ রিপোর্টের একটা বক্তব্য অন্য বক্তব্যকে অস্বীকার করেছে। (গ) রামভক্ত সরকার যখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন, তখন প্রত্নতত্ত্ববিদদের প্রবাবিত করা বা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের পক্ষে খেয়ালখুশি মত রিপোর্ট লিখিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়।

তাছাড়া ঐ রিপোর্ট সততা, বুদ্ধিমত্তা ও নিরপেক্ষতার সাথে পর্যালোচনা করলে ঐ রিপোর্ট থেকেই বাবরী মসজিদের নীচে কোন মন্দির নয় বরং যদি কিছু থেকেই থাকে তাহলে সেটা মসজিদ হওয়ায় সম্ভব এটা খুব সহজেই প্রমান করা যাবে। কারণ ঃ-

(ক) প্রথমত, রিপোর্টে বলা হয়েছে—বাবরী মসজিদস্থলের নীচে একটি কাঠামো ছিল এবং সেটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা ১৫০ ফুটের বেশী এবং পূর্ব-পশ্চিমে চওড়া ১০০ ফুটের কম। তর্কের খাতিরে যদি এই পরিমাণ লম্বা-চওড়া কোন কাঠামোর নিদর্শন থেকে থাকে, তবে তা কোন মন্দিরের কাঠামো হতে পারে না। এবং নিশ্চিত ভাবেই ঐ কাঠামো মসজিদের হওয়ায় সম্ভব। কারণ মসজিদ ও মন্দিরের নির্মাণ শৈলী প্রায় বিপরীত। মন্দিরের নির্মাণ শৈলীতে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ও পুব-পশ্চিমে চওড়া হওয়ার কৃষ্টি প্রচলিত নয়। বরং মসজিদ নির্মানের কৃষ্টি বা প্রথা হল—লম্বা হবে উত্তর দক্ষিণ, আর চওড়া হবে পূর্ব-পশ্চিমে।

(খ) রিপোর্টে বাবরী মসজিদের ঠিক নীচে যে কাঠামোর কথা বলা হয়েছে তার সংলগ্ন জলের ফোয়ারার উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মন্দিরে পূজার্চনা করার জন্য সামান্য কিছু পরিমাণ বিশেষ নদ-নদীর জলের প্রয়োজন হলেও, এত জলের প্রয়োজন হয় না যার

জন্য ফোয়ারা বানানোর দরকার। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশের এবং উপাসনার জন্য জল অপরিহার্য। কারণ বিনা ওযুতে নামায বা কোরান পাঠ কোনটাই হয় না। সুতরাং মসজিদই একমাত্র উপাসনা গৃহ যার সংলগ্ন জলের বন্দোবস্ত থাকা এবং প্রচুর পরিমাণ জলের বন্দোবস্ত থাকা জরুরী। প্রত্নতাত্ত্বিকদের এই রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত হয় যে বাবরী মসজিদের নীচে মাটি খুঁড়ে যদি কোন কাঠামো থাকার প্রমাণ সত্যিই পাওয়া গিয়ে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে মসজিদেরই কাঠামো, মন্দিরের নয়। (গ) রিপোর্টে বলা হয়েছে মসজিদের নীচে যে কাঠামো বা কাঠামোগুলির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির ব্যবহার ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ সেই ভগ্ন কাঠামোস্থলের কোথাও রাম, সীতা, হনুমানসহ কোন দেবদেবীর মূর্তির উপস্থিতি নিশ্চয়ই পাওয়া যায় নি। এটা সকলেরই জানা কথা যে মূর্তি পূজারী জনগোষ্ঠী তাঁদের উপসনা গৃহে বহু দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং ১০০০-১৫০০ বছর আগের কাঠামোর বহু নিদর্শনের মধ্যে দু-চারটে অন্তত পক্ষে কোন না কোন দেবদেবীর মূর্তি খুঁজে পাওয়ার কথা ছিল। আক্ষেপের কথা এটাই যে, প্রত্নতত্ত্ববিদরা এক্ষেত্রে সে রকম কিছু পাওয়ার মত নির্ভেজাল মিথ্যা কথা বলে রাম ভক্তদের খুশি করতে পারেন নি। (ঘ) রিপোর্টে বলা হয়েছে—বাবরী মসজিদের ৫০ মিটার নীচে উল্লেখিত কাঠামোটির অস্তিত্ব আছে। অথচ খনন কার্য অতো নীচে পর্যন্ত আদৌ করা হয় নি। সুতরাং মসজিদের নীচে কাঠামোর উল্লেখ আদৌ সত্য নয় একথা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। (ঙ) রিপোর্টে বলা হয়েছে—মাটির নীচে খোঁড়াখুঁড়ি করে বিজেপির নির্বচনী প্রতীক পদ্মফুলের মডেল পাওয়া গেছে। এই হাস্যকর কথা আর একবার নতুন করে প্রমান করে দেয় যে, রামভক্ত কেন্দ্রীয় সরকার, সংঘ পরিবার ও রামভক্ত রাজনৈতিক দল ভাজপার চাপে পড়েই প্রত্নতত্ত্ববিদ বন্ধুরা এই রিপোর্ট তৈরী করে থাকবেন অথবা রামভক্ত সংগঠন, নেতা ও সরকারকে খুশি করে আখের গুছিয়ে নেওয়ার ধান্দায় অনুরূপ মনগড়া, পরস্পর বিরোধী, নির্ভেজাল মিথ্যা রিপোর্ট তৈরী করে থাকবেন।

আলোচিত প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার মাত্র দুই মাস

আগে একই প্রত্নতাত্বিক সংস্থা অযোধ্যায় বাবরী মসজিদের নীচে উপর্যোপরি খনন কার্য চালিয়েও কোন মন্দির কাঠামোর নিদর্শন খুঁজে পায় নি। বরং যা পেয়েছে তা হল—মসজিদের কাঠামো অথবা মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ। গত ইং ১৮-৬-০৩ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক গণশক্তি পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—গত ইং ১৭-৬-০৩ তারিখে রাজধানী নয়া দিল্লীতে এক ভিড় ঠাসা সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের প্রথিত যশা প্রত্নতাত্বিক ও ঐতিহাসিকরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন "মন্দির নয়, বাবরী মসজিদের নির্মানের আগে ওখানে আর একটি মসজিদ ছিল। 'সহমত' আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রত্নতাত্বিক সুরযভান ও ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব অভিযোগ করেছেন, অনভিজ্ঞ জাপানী সংস্থা তোজো বিকাশ ইণ্টারন্যাশনাল-এর র‍্যাডার সমীক্ষার ভিত্তিতেই এখানে মন্দির ছিল কিনা তা খুঁজে বের করতে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে নির্দেশ দেয় এলাহাবাদ হাই কোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ। কিন্তু সরকারী সমীক্ষক বা প্রত্নতাত্বিক দলটি খুঁজে পায় নি মন্দির কাঠামোর চিহ্ন। সে কথা আদালতে পেশ করা অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে উল্লেখ করেছে এ, এম, আই। প্রত্নতাত্বিক সুরযভান বলেন, তিনি নিজে অযোধ্যায় খনন কার্য চলাকালীন খননস্থলে ছিলেন ১০-৬-০৩ থেকে ১২-৬-০৩ তারিখ পর্যন্ত। তিনি নিজে খনন কার্য পরিদর্শন করেন এবং ৩০ মিটার দীর্ঘ একটি পরিখার নীচে তিনি নিজে নেমে ছিলেন। তাঁর অভিমত প্রমানের জন্য এতদিন সময় লাগার প্রয়োজন ছিল না। 'তিনি সরজমিনে প্রত্যক্ষ করার পর এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মসজিদের নীচে মন্দির কাঠামো ছিল বলে এতদিন ধরে যে প্রচার করা হচ্ছিল তা সবটাই মিথ্যা। এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

এছাড়া খননে প্রাপ্ত সামগ্রী দেখে সুরযভান বলেন, খনন করে প্রাপ্ত মেঝের নিদর্শন দেখে মনে হয় বাবরী মসজিদের আগে ওখানে আর একটি মসজিদ ছিল। মসজিদটি ছিল ইট দিয়ে তৈরী এবং তার আকৃতিও ছিল প্রায় বাবরী মসজিদেরই মত। তবে উচ্চতার দিক দিয়ে সেটি ছিল বাবরী মসজিদের থেকে দেড়ফুট মত কম। তিনি একথা বলতেও দ্বিধা করেন নি যে বিশেষজ্ঞ দিয়ে আরো পরীক্ষা নিরিক্ষা চালালে প্রমানিত হয়ে যাবে, যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে মন্দিরের দাবী করা হচ্ছে তা

সত্য নয়। প্রমান ছাড়া বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।তিন আরো বলেন যে, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রবল চাপের মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছে। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বলেন, বাবরী মসজিদ সহ রাম চবুতরা এলাকার বেশ কয়েক মিটার গর্ত্ত খোঁড়া হলেও মন্দির কাঠামোর হদিশ মেলে নাই। উপরন্তু যা পাওয়া গেছে তা মসজিদেরই ধ্বংসাবশেষ। অযোধ্যার মসজিদ এলাকায় ৫২টি পরিখা খনন করার পর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া আদালতে যে রিপোর্ট জমা দেয় তাতে বলা হয়েছে, কোন মন্দির কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নি। বরং যা পাওয়া গেছে তা সবই মুসলিম যুগের অথবা মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের নিদর্শন এবং আরবী ভাষায় লেখা ধর্মীয় বাণী এবং চাকচিক্যময় টালি ইত্যাদি।

এখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রামভক্ত সরকার আদালতকে বুড়ি ছোঁওয়া করে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কিছু অনুগত সদস্যকে দিয়ে মন্দিরের দাবীর পক্ষে যাবে এমন রিপোর্ট তৈরী করিয়ে নিয়ে কার্য সিদ্ধি করতে উঠেপড়ে লাগলেও ন্যায় ও সত্যকে বাদ দিয়ে অযোধ্যায় মসজিদ-মন্দির বিতর্কের শান্তিপূর্ণ সমাধান অসম্ভব।

প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু ঃ

চতুর ইংরেজ মসজিদ-মন্দির বিতর্ক লাগিয়ে এদেশের হিন্দু মুসলমানের চিরস্থায়ী সংঘাতের পথটা নির্মান করে দেশ ছাড়া হওয়ার পরপরই এদেশের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা কিছুদিন সেই পথে চলে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়লেন। স্বাধীনতার পর থেকে ৫-৬ বছর হিন্দুত্ববাদীরা এই বিতর্ক নিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করেছিল। তারপর থেকে একটানা প্রায় ত্রিশ বছর এই মসজিদ-মন্দির বিতর্ক নিয়ে কোন ব্যক্তি অথবা সংগঠন ইত্যাদি কোন মহল থেকেই বিশেষ মাথা ঘামানো হয়নি। হঠাৎ করে এই মসজিদ-মন্দির বিতর্কের ছাইচাপা আগুনে ঘৃতাহুতি হল ১৯৮৬

সালে। পাঠক বন্ধুদের মনে থাকতে পারে ১৯৮৫ সালে দিল্লির সুপ্রিম কোর্ট 'শাহবানু মামলায়' শরিয়তের বিরুদ্ধে এক গ্রহনযোগ্যহীন রায় দিয়ে বসে। সারা দেশের মুসলমানেরা এই শরীয়ত বিরোধী রায়ে হতাশ হয়ে বিক্ষোভ, আন্দোলন শুরু করে। দেশের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাজীব গান্ধী অত্যন্ত বিচক্ষনতার সঙ্গে লোকসভায় মুসলিম মহিলা বিল পাশ করিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায়কে খারিজ করিয়ে দিয়ে মুসলমানদের আশ্বস্ত করেন। রাজনীতিতে কাঁচা প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে তাঁর বন্ধু ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ অরুণ নেহেরু বোঝালেন মুসলমানদের জন্য তো একটা বড় কিছু করা গেল, এখন হিন্দুদের জন্য এরকম একটা কিছু না করলে তো হিন্দু ভোটারদের মন পাওয়া যাবে না। সুতরাং হিন্দুদের জন্য অযোধ্যায় পূজা করার জন্য বাবরী মসজিদের তালা খুলে দেওয়া হোক। তখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বীর বাহাদুর সিং। এই প্রস্তাব শুনে বীর বাহাদুর সিং অত্যন্ত খুশী হলেন এবং রাজীব গান্ধীকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। ফৈজাবাদ আদালতকে 'শিখণ্ডী' করে বাবরী মসজিদের তালা খুলে দেওয়া হল ১৯৮৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। বীর বাহাদুর সিং, অরুণ নেহেরু প্রমুখ রাম ভক্তরা স্লোগান দিলেন—"ভগবান রামচন্দ্র কি জয়!"

১৯২১ সালে সৃষ্ট অযোধ্যার বাবরী মসজিদ-রাম মন্দির বিতর্কের ১ম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯৮৬ সালে। শুরু হল দ্বিতীয় পর্যায়। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল, একটানা ৬৫ বৎসর এ মিসজিদ মন্দির বিতর্ক, বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ তে বিতর্ক লড়াই, রক্তক্ষরণ, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হল। অতীতের পরিসমাপ্তি ঘটল। অযোধ্যার বাবরী মসজিদ আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল বর্তমানের পথে।

বর্তমানের পথে—কুম্ভমেলা ঃ—

বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ইতিহাসে কলঙ্কিত দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে তিনটি সাল। ১৯২১, ১৯৮৬ আর ১৯৯২ সাল। ১৯২১

সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ঘটনার উপর সংক্ষেপে আলোচনা হয়েছে আগেই। এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত। তালা খোলার পর যা হওয়া স্বাভাবিক ছিল তাই হল। উগ্র হিন্দুত্ববাদী-মেকী রাম ভক্তরা পালে হাওয়া পেল। দেশ জুড়ে শুরু হল সংখ্যা লঘু দূর্বলদের উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের নৃশংস আক্রমণ। মেকী রামভক্ত উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাতে দেশের মুসলমানরা খুন হতে লাগল। এক বছরের মাথাতে সরকারী হিসাবে মুসলমান খুন হলেন প্রায় চারশত। ২য় বছরে খুন হলেন ৬০০ জনের বেশী। ৩য় বছরে ১৯৮৯ সালে প্রয়াগে বসল কুম্ভমেলা।

শিলান্যাস ঃ—

বিশ্বহিন্দু পরিষদের উদ্দ্যেগে প্রয়াগে বসল কুম্ভমেলা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাম চন্দ্র পরম হংস দাস, বামন দেব মহারাজ, মহন্ত নিত্য গোপাল দাস, মহন্ত অবৈদ্যনাথ, স্বামী চিন্ময়ানন্দ, আচার্য ধমেন্দ্র, উমা ভারতী, স্বাধ্বী ঋতম্ভরা প্রমুখ। কুম্ভ মেলার নেতা মিঃ অশোক সিংহল। মহন্ত নিত্যগোপাল দাসের পরিকল্পনা হল—কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে অযোধ্যায় পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঐ সময় অযোধ্যায় কয়েক লক্ষ লোক হাজির হয়। ভীড় থাকে রাশ পূর্নিমা পর্যন্ত। সুতরাং এটাই শিলান্যাসের উপযুক্ত সময়। পাঁজি ক্যালেণ্ডার দেখে দিন ধার্য হল ৯ই নভেম্বর ১৯৮৯। ঐদিন হবে ভুমি পূজো, পরদিন হবে শিলান্যাস।

ইঁট পূজা ঃ— কুম্ভমেলায় স্থির হল ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে সারা দেশে ইঁট পূজা। ইঁটের গায়ে লেখা হবে –জয় শ্রীরাম। তারপর ইঁটের রামশীলা নিয়ে হবে মিছিল। সেই সঙ্গে তহবিল ও সংগ্রহ করা হবে পাঁচশিকে করে। শ্রীরাম লেখা ইঁট সব জড়ো হবে অযোধ্যায়। পরিকল্পনা মত কর্মসূচীর রূপায়ণ শুরু হল। রামের নামে পূজো করা ইঁট মাথায় নিয়ে রামভক্তরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে মুসলমান বস্তীগুলিকে টার্গেট বানালো। সাসারাম, বাদাউন, ইন্দোর ইত্যাদি বহুস্থানে আক্রান্ত, জখম ও খুন হল সংখ্যালঘুরা। ঐ

সময় সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু নিধন হয়েছিল বিহারের ভাগলপুরে। পাঠক বন্ধুদের স্মরণ থাকতে পারে ১৯৮৯ সালের ভাগলপুর দাঙ্গার কথা। তখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভগবত ঝা আজাদ। ঐ সময়ের ভাগলপুরের মুসলিম নিধনের ঘটনা আজও স্মৃতি হয়ে আছে।

মাচান বাবা ঃ— ৮৯ এর লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী বুঝলেন শিলান্যাসের কুফল। মুসলিম ভোট হাতছাড়া তো হচ্ছেই, হিন্দু ভোটকেই ভরসা করা ছাড়া উপায় কি ? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ বুটা সিংকে সাথে নিয়ে রাজীব গান্ধী ১৯৮৯ সালের ৬ই নভেম্বর পৌঁছালেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনে দেওরিয়া বাবা নামে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম। তিনি জমিনে পা রাখেন না কখনও। সব সময় গাছের উপর অথবা মাটির উপর মাচা বেঁধে তার উপরে থাকেন। তাই সব সময় মাচার উপর থাকেন বলেই তাকে লোকে 'মাচান বাবা' বলে ডাকে। রাজীব গান্ধী গেলেন মাচান বাবার আশ্রমে । মাচায় বসা মাচান বাবার পায়ের নীচে মাথা রেখে রাজীব গান্ধী তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। মাচান বাবা বললেন, ''বেটা শিল্যান্যাস হোনে দিজিয়ে''। ৮ই নভেম্বর ৮৯ উত্তর প্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তিওয়ারী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিং, বিশ্বহিন্দু পরিষদ নেতা অশোক সিংহল বৈঠক করলেন। অযোধ্যার ৫৮৬ নং প্লটে হলো ভূমি পূজা। উত্তর প্রদেশ সরকারের আর্মড ফোর্সরা নিরব দর্শক হয়েই শুধু নিরস্ত থাকলেন না, রামভক্তদের সাথে গলা মিলিয়ে স্লোগান দিলেন— ''বাচ্চা বাচ্চা রামকা, জনমভূম পর কামকা''।

পুলিশের এহেন ভুমিকায় ও নির্লজ্জ আচরণে ক্ষোভে ফেটে পড়ল মুসলমানেরা। বাবরী মসজিদ অ্যাকশন কমিটির ডাকে ফৈজাবাদে বন্ধ পালিত হল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উলঙ্গ-নির্লজ্জ ভূমিকার প্রতিবাদে ও শিলান্যাসের প্রতিবাদে ফৈজাবাদের মুসলমানেরা মিছিল বার করলো। মিছিল থেকে আওয়াজ উঠলো—চলো অযোধ্যা, অযোধ্যা চলো। কিন্তু না, অযোধ্যা আর যাওয়া হলো না ফৈজাবাদের মসজিদ প্রেমী মানুষগুলোর। উত্তর প্রদেশ সরকারের রামভক্ত পুলিশ ফৈজাবাদেই তাদের গ্রেপ্তার করলো।

মসজিদ ভক্তদের মসজিদ ভক্তির উদ্দোগ অঙ্কুরেই ভেঙ্গে দিয়ে

বুঝিয়ে দেওয়া হল এদেশে রামভক্তদের যে অধিকার আছে, মসজিদ ভক্তদের সে অধিকারের কথা ভাবাও অপরাধ।

আদবানীর রায়ট যাত্রা ঃ

পাঠক বন্ধুদের নিশ্চয় জানা আছে আদবানীর রথযাত্রার কথা। রাম মন্দিরের দাবীর পালে ঝড় লাগাতে মিঃ আদবানী রথযাত্রায় বার হয়েছিলেন। ১৯৯০ সাল, ২৫শে সেপ্টেম্বর জনসংঘ নেতা প্রয়াত দীন দয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন। লালকৃষ্ণ আদবাণী রামরথে উঠলেন সাথে প্রমোদ মহাজন। গুজরাটের জুনাগড়ে সোমনাথ মন্দিরে পূজো দিয়ে কলির কৃষ্ণ আদবাণী লালকৃষ্ণ উঠলেন রামরথে। রথের একদিকে বিশাল রামের মূর্তি অন্যদিকে বিজেপি-র নির্বাচনী প্রতীক পদ্মের ছবি। সারা ভারত বর্ষের গনতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী মানুষ আওয়াজ তুললেন আদবানীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। রামরথ গুজরাত থেকে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা ঘুরে দিল্লীর দিকে এগোতে লাগল। রামরথ থেকে মাইকের আওয়াজ হচ্ছিল—'সৌগন রাম কি খাতে হ্যায়, হাম মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে।' এই ভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আর উন্মাদনা ছড়াতে ছড়াতে কলির কৃষ্ণ আদবানী ভারতবর্ষের একটা প্রদেশ থেকে আর একটা প্রদেশ ঘুরে ১৮ই অকটেবর দিল্লী ঢুকলেন। ২০শে অকটেবর ঢুকলেন ধানবাদে, সেখান থেকে রাঁচি। আদবানীর রামরথের চাকা যেদিকেই গড়িয়েছে অশান্ত হয়েছে সেদিকই। মারামারি, খুনোখুনি শুরু হয়েছে। হিন্দু -মুসলমান রায়ট বেঁধেছে। আদবানীর রায়ট রথের চাকা কিছুতেই থামে নি। ২১শে অকটেবর গয়া হয়ে ২২শে অকটেব র পাটনা থেকে আদবানীর রায়ট রথ সমস্তিপুরের পথে অগ্রসর হল। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের সরকার এই রায়ট যাত্রার পথ আটকাতে সাহস হলেন না। অবশেষে বিহার কেশরী লালু প্রসাদ যাদব আটকে দিলেন রায়ট রথের চাকা, গ্রেপ্তার করলেন আদবানীকে। সমাপ্তি ঘটল আদবানীর রায়ট যাত্রার।

মসজিদ ধ্বংসের প্রাক প্রস্তুতি ঃ

১৯৯১ এর লোকসভা নির্বাচনে ২২৪ জন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলেন পি, ভি, নরসিমা রাও। ৯১ এর ২১শে জুন প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন তিনি। ২৪শে জুন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিজেপি-র কল্যাণ সিং। ২৪শে জুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়ে পরদিন ২৫শে জুন অযোধ্যা গেলেন কল্যান সিং। সঙ্গে গোটা মন্ত্রীসভা। অযোধ্যায় রামলালা দর্শন করলেন, পূজো দিলেন, সষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। উল্লেখ করার মত কথা হল কল্যাণ সিং-এর মন্ত্রী সভায় একজন মুসলমানের বাচ্চা মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর নাম ইজাজ রিজভি। তিনিও জয় শ্রীরাম আওয়াজ তুলে কল্যান সিংদের সব রকম রাম ভক্তির অংশীদার হতে দ্বিধা করেন নি। যাই হোক ক্ষমতাই বসেই কল্যান সিং রাম মন্দির নিয়ে এগিয়ে চললেন। ৭-১০-৯১ তারিখে উত্তর প্রদেশ সরকারের পর্যটন সচিব অশোক সিনহা এক নোটিশ জারী করে অযোধ্যার মসদিজ সংলগ্ন মসজিদের পূর্বদিকের চারটি প্লট যার পরিমাণ ২-৭৭ একর অধিগ্রহন করলেন। নোটিশে বলা হয়, অযোধ্যায় আগত তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের স্বার্থে এই জমি অধিগ্রহন করা হইল। মজার কথা এই ঘটনা কিন্তু উত্তর প্রদেশের বহুল প্রচারিত কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত করা হল না। উত্তর প্রদেশ সরকার কৌশল করে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য দু-একটি অপেক্ষাকৃত কম প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করে জনগনের সাথে লুকোচুরি খেলেছিল। যাই হোক কোন ক্রমে বাবরী মসজিদের সম্পত্তি চুপিসারে কল্যাণ সরকার কতৃক বেআইনিভাবে অধিগ্রহনের খবর জানতে পারেন আবদুল হাসিম নামে এক আল্লাহর বান্দা। তিনি উত্তর প্রদেশ সরকারের বাবরী মসজিদের সম্পত্তি অধিগ্রহনের বিরুদ্ধে চালেঞ্জ জানিয়ে হাই কোর্টে মামলা করলেন। জনাব হাসিম সাহেবের বক্তব্য ছিল উত্তর প্রদেশ সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত সম্পত্তি যেহেতু ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি, সেইহেতু ঐ সম্পত্তি ওয়াকফ আইন অনুসারে রাজ্য সরকার যাধিগ্রহন করতে ও অন্য কোনভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ঐ মোকর্দমায় প্রিয় বন্ধু হাসিম ভাই বিজয়ী হন। ঐ মোকর্দমায় হাই কোর্ট রায় দেয়

বাবরী মসজিদের চারটি প্লট অধিগ্রহণ বেআইনি। তবে তাজ্জব হবার মতো কথা এটাই যে হাই কোর্ট এই রায় দেয় বাবরী মসজিদ ধুলিস্যাৎ হবার ৫ দিন পর অর্থাৎ ১৯৯২ সালের ১১ই ডিসেম্বর। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ অবাক হয়ে প্রশ্ন তুলল, হাইকোর্ট এই মোকর্দমার রায় দিতে এত দেরী করল কেন ? মাত্র ১ সপ্তাহ আগে রায় বেরুলে বোধ হয় বাবরী মসজিদ ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পারত।

লক্ষ্মণ মন্দির ঃ ১৯৯২ সালের ২৩শে জুলাই ৬জন রাম ভক্ত নেতাকে উড়ো জাহাজে চাপিয়ে প্রধান মন্ত্রী মিঃ নরসিমা রাওয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় আলোচনা করার জন্য। এরা হলেন শ্রীরাম কর সেবা সমিতির সভাপতি বামদেব মহারাজ, সাধ্বী ঋতম্ভরার গুরু স্বামী পরমানন্দ, মহন্ত নিত্যগোপাল দাস, রাম চন্দ্র পরম হংস দাস, মোহন্ত অবৈদ্যনাথ ও স্বামী ধর্মেন্দ্রজী। মিঃ নরসিমা রাওয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করে শেষ পর্যন্ত রামভক্ত সাধুবাবারা প্রধান মন্ত্রীকে চার মাস সময় দেন সমস্যার সমাধান করার জন্য অর্থাৎ এই চার মাস সময়ের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী মসজিদ স্থলে মন্দির নির্মানের কোন ব্যবস্থা না করলে সাধুরা নিজেদের মত চলবেন বলে জানিয়ে দেন। এবং উল্লেখিত ৬ জন রামভক্ত সাধু নেতা মিলে স্থির করেন রাম মন্দিরের জন্য করসেবার আগে ভাই লক্ষ্মনের জন্য লক্ষ্মন মন্দিরের কর সেবা করা দরকার। তাই অযোধ্যার রাম মন্দির থেকে সামান্য দরে লক্ষ্মণ মন্দিরের করসেবা শুরু করেন।

পাদুকাসেবা ঃ

রামভক্ত সাধু নেতারা লক্ষ্মন মন্দিরের করসেবা করতে করতে হঠাৎ তাঁদের মনে পড়ল ভগবান রাম চন্দ্রের আর এক ভাই ভরতের কথা। রামায়ণে আছে, ভরতচন্দ্র অযোধ্যা থেকে ৩০ কিমি দূরে তাঁর মামার বাড়ী নন্দীগ্রামে দাদা শ্রীরাম চন্দ্রের পাদুকা পূজা করেছিলেন। তাই তাঁরাও রামের পাদুকা পূজা করবেন। বিশ্বহিন্দু পরিষদ হাজার হাজার পাদুকা বানালো। ঐ পাদুকা সারা দেশের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে

দেওয়া হল পূজো করার জন্য। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতারা মানুষকে যতো বোকা মনে করে, মানুষ অতো বোকার পরিচয় দিল না, তাই এই পাদুকা পূজো বেশী জমলো না। সাধু নেতাদের পাদুকা চাল বন্ধ হয়ে গেল

করসেবা ঃ—

সংঘ পরিবার ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যায় করসেবার ডাক দিল। সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি এম, এন, বেঙ্কট চালাইয়া ও জি, এন, রায় এর যৌথ বেঞ্চ অযোধ্যা মামলার এক আদেশে পরিস্কার বললেন, বিতর্কিত ২-৭৭ একর জমিতে কোন প্রকার করসেবা করা যাবে না। সংঘ পবিবারের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রামভক্ত করসেবকরা অযোধ্যার পথে যাত্রা শুরু করে দিল। ১লা ডিসেম্বর ১৯৯২ তারিখ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের করসেবকরা অযোধ্যায় পৌঁছাতে শুরু করল করসেবার উদ্দেশ্যে।

রাজনৈতিক দলগুলির ভণ্ডামি ঃ করসেবা উপলক্ষে ১লা ডিসেম্বর ১৯৯২ তারিখ থেকে আদবানীজি বেনারসে ও মুরলী মনোহর যোশী মহাশয় মথুরায় মিছিল শুরু করেন। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঠিক আগের দিন ৫ই ডিসেম্বর ৯২ উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে এক বিশাল সভার আয়োজন করা হয়। সভায় যারা বক্তৃতা করেছিলেন তাঁরা হলেন—অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানী, কল্যান সিং, মুরলী মনোহর যোশী ও অশোক সিংহল। সভা শেষে বাজপেয়ী দিল্লী রওনা হলেন, আর মিঃ আদবানী, যোশী, সিংহল, অযোধ্যা এসে পৌঁছালেন রাত তখন ১টা। বাবরী ধ্বংস হতে মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকী।

কোথায় নানীর কবর আর কোথায় নাতি কাঁদে ? বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার তোড়জোড় শুরু হচ্ছে অযোধ্যায় আর তা আটকাতে সিপিএম জমায়েত ডাকল কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে। পঃ বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ৪ঠা ডিসেম্বরের শহীদ মিনারের সভায় বললেন, "উত্তর প্রদেশ সরকারকে বরখাস্ত না করে, কেন্দ্র অযোধ্যার বিতর্কিত চত্তরটি অধিগ্রহন করুক।" কি চমৎকার

সমাধান সূত্র। 'বিতর্কিত চত্তর' রক্ষা করার জন্য অধিগ্রহন কর। কিন্তু রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করা চলবেনা। যে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে মন্ত্রী সভার সব সদস্যকে নিয়ে অযোধ্যায় মসজিদ চত্তরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে এলেন—মন্দির এখানেই বানাবো, সেই মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হবে না। বিতর্কিত চত্তরটা শুধু অধিগ্রহন করো। ৪ঠা ডিসেম্বর '৯২ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মত দায়িত্বশীল একটা দল তার দায় খালাস করলো উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ আদালত চত্তর থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত শান্তি মিছিলের ডাক দিয়ে। ৫ই ডিসেম্বর সকালে লক্ষ্ণৌ থেকে ৬০ কিমি দূরে বারাবাঙ্কি জেলার রামসেনাহি ঘাট নামক স্থানে গ্রেপ্তার বরণ করে মুসলমানদের মন জয় করলেন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ভি, পি, সিং। কলকাতার সিধে-কানহু ডহরে যুব কংগ্রেসের এক সভায় বিজেপিকে একটু গালিগালাজ করে দায় সারলেন পঃ বঙ্গের সৌমেন দাদা আর মমতা দিদিরা।

মার্গদর্শক মণ্ডলের সিদ্ধান্ত ঃ অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ স্থলে রাম মন্দির নির্মানের শীর্ষ কমিটির নাম হল মার্গ দর্শক মণ্ডল। ৫ই ডিসেম্বর সকালে মার্গ দর্শকমণ্ডলের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে স্থির হয়, ১১ই ডিসেম্বর কোর্টের রায় বের হবার দিন। সুতারাং ঐ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা হোক। সাধুবাবারা গোপনে বৈঠক করে স্থির করলেন করসেবা করতে গেলে কেন্দ্র কল্যাণ সিং সরকারকে বরখাস্ত করবে। এতে মন্দির নির্মানের পথে লাভের থেকে লোকসান বেশী হতে পারে। আর, এস, এস-এর সদর দফ তর নাগপুর থেকে টেলিফোনে নির্দেশ এল এমন কিছু না করতে যাতে কল্যান সিং সরকার ভেঙ্গে যায়। কারণ সরকার বেঁচে থাকলে আগামী দিনে লাভ বেশী হবে। সাধুবাবারা বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলেন ৬ই ডিসেম্বর সরযু নদীর তীরে বালি ও জল দিয়ে প্রতীকি করসেবা করা হবে। এবং এই করসেবার শুভ লগ্ন স্থির হল ১২-১৫ মিনিট। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সব সিদ্ধান্ত, জল্পনা, কল্পনার অবসান ঘটলো ৬ই ডিসেম্বর '৯২ তারিখে। ধ্বংস হলো সাড়ে চারশো বছরের পুরাতন আল্লাহর ঘর বাবরী মসজিদ। ভেঙ্গে পড়ল সব বিশ্বাস আর প্রতিশ্রুতির স্তম্ভ। ধ্বংস হল ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতা, ধর্ষিত হল ভারতবর্ষের ঐতিহ্য আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শেষ সম্বলটুকু।

জাতীয় সংহতি পরিষদের ভুমিকা ঃ-

সারা ভারত বর্ষ এখন উত্তাল ৬ই ডিসেম্বরের করসেবাকে কেন্দ্র করে। টান টান উত্তেজনা সারা দেশ জুড়ে। শঙ্কা আর ভীতির মধ্যে দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে দেশের সংখ্যা লঘুদের। এমন সময় আশার বাণী শোনা গেল। জাতীয় সংহতি পরিষদ বসছে আলোচনায়। ১৯৯২ এর ২৩শে নভেম্বর অনেক দেরীতে হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবার আগেই প্রধান মন্ত্রী মিঃ নরসিংহ রাও -এর আহ্বানে জাতীয় সংহতি পরিষদ বসল আলোচনায়। সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে শেষ হল অধিবেশন। পরিষদ অযোধ্যার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের ও মসজিদ কাঠামো সুরক্ষার চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করলো প্রধান মন্ত্রী মিঃ নরসিংহ রাওকে। দেশবাসী খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সংখ্যা লঘুরা স্বস্তিবোধ করলেন। কিন্তু কালের নির্মম পরিহাস, বাবরী মসজিদ ধ্বংসই হল শেষ পর্যন্ত। সর্ষের মধ্যে ভুত থাকলে সেই সর্ষে পড়া দিয়ে ভূত ছাড়ানো যায় কি ?

৬ই ডিসেম্বর

(একটি কালো অধ্যায় ঃ কি ঘটেছিল সেদিন ?)

সকালে অযোধ্যার 'রাম কথা পার্কে' করসেবকদের একটা সমাবেশ ডাকা ছিল। সকাল ৯টায় শুরু হল সেই সমাবেশ। মঞ্চ করা হয়েছিল একটি একতলা বাড়ীর ছাদের উপর। মঞ্চের চারদিকে তখন করসেবকদের ভীড় উপচে পড়ছে। বিজেপি সাংসদ বিনয় কাটিয়ার মাইক নিয়ে সকলকে বসতে বললেন। অশোক সিংহল, বিজয় রাজ সিন্ধিয়া, মুরলী মনোহর যোশী, লালকৃষ্ণ আদবানী, উমা ভারতী, সাধ্বী ঋতম্ভরা সকলে বসলেন মঞ্চে। বক্তৃতা শুরু হল। সমাবেশে ঘোষণা করা হল সভা শেষে সরযুর বালি আর জল দিয়ে করসেবা করা হবে। কেউ যাতে বিতর্কিত চত্তরে না যায় তার সাবধান বাণী উচ্চারিত হল সমাবেশ মঞ্চ থেকে। খাকি হাফ প্যাণ্ট ও সাদা সার্ট পরা প্রায় দুইশত আর, এস, এস, স্বেচ্ছাসেবক পাহারায় ছিলেন বিতর্কিত চত্তরে। এই

স্বেচ্ছাসেবকদের উপর নির্দেশ ছিল বিতর্কিত চত্তরে কাকেও ঢুকতে না দেবার। বিতর্কিত চত্তর ফাঁকা মসজিদের মধ্যে তখন সি, আর, পি-র জওয়ানরা রাইফেল হাত পাহারায়। এছাড়া সি, আর, পি-র মহিলা ব্যাটেলিয়ানসহ উত্তর প্রদেশ রাজ্য পুলিশ ও, পি, এস, সি বাহিনী। তখন পৌনে ১২টা। সভা তখনও চলছে। হঠাৎ কিছু যুবক মসজিদের উপর ঢিল ছুড়তে লাগল। রাইফেলধারীরা একটু গাঁ ঝাড়া দিল। আর, এস, এস,-এর খাকি প্যাণ্ট পরা করসেবকরা তাদের তাড়া করলো। আরও 'বেশী সংখ্যায় করসেবকরা জয় শ্রীরাম আওয়াজ তুলে মসজিদের দিকে এগিয়ে গেল। মসজিদের মধ্যে ঢুকে গম্বুজের উপর চড়াও হল। অযোধ্যার পাশেই আকবরপুর। সেখানকার শিবসেনার বিধায়কের নাম পবন পাণ্ডে। পেশা তার গুণ্ডাবৃত্তি। এই পবন পাণ্ডের বাহিনী অ্যাকশন শুরু করলো। মসজিদে চড়াও হয়ে গম্বুজ ভাঙ্গার কাজ আরম্ভ হল। পুলিশ, সি-আর-পি, পি-ও-সি সব তখন নীরব দর্শক। সাংবাদিকরা বিচলিত। আলোক চিত্রিরা ছবি তুলতে ব্যস্ত। করসেবকদের হাতে আক্রান্ত হলেন সাংবাদিক ও আলোক চিত্রিরা। মসজিদের ২০ ফুট দূরে সি-আর-পি র কন্ট্রোল টাওয়ার। একতলা বাড়ী। তার চাদের উপর ফৈজাবাদের ডি, আই, জি মিঃ উমাশংকর বাজপেয়ী, জেলা শাসক আর, এন, শ্রীবাস্তব, পুলিশ সুপার দেবেন্দ্র বাহাদুর রায় এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের পর্যবেক্ষক তেজশঙ্কর মহাশয় ইত্যাদি সরকার ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তারা। সুপ্রীম কোর্টের পর্যবেক্ষক মাননীয় তেজশঙ্কর মহাশয় ওয়াকিটাকিতে বারবার বলে চলেছেন "মাস্ক অ্যাটাকড।"

ইতিমধ্যে করসেবকরা মসজিদের চারধারে এসে হাজির। তাদের হাতে মোটা মোটা দড়ি। দেওয়াল দুদিক থেকে কেটে তার মধ্য দিয়ে মোটা দড়ি লাগিয়ে শতশত কর সেবক গায়ের জোরে টেনে দেওয়াল ফেলে দেয়। অযোধ্যার ওয়েল্ডিং শপ থেকে গ্যাস কাটার এসে হাজির হল। লোহার রেলিং কাটা হল। হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল বড়বড় দেওয়াল ও কংক্রীট। দূভাগ্যবশতঃ বাবরী মসজিদ থেকে কিছু দূরে লক্ষ্মন মন্দির নির্মানের কাজ চলছিল, সেখান থেকে ভাঙ্গার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা হল। দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে মসজিদে

ওড়ানো হল বিশ্বহিন্দু পরিষদের পতাকা। ১২-১৫ মিনিটে সারা অযোধ্যা শাঁখ, কাঁসা আর ঘন্টা ধ্বনিতে মুখরিত হল। ছাদের উপরের মঞ্চ থেকে তখন মাইকের আওয়াজ ভেসে আসছে। উমা ভারতী, সাধ্বী ঋতম্ভরারা মাইকে বলছেন, "এক ধাক্কা ঔর দো, বাবরী ধাঁচা তোড় দো"। করসেবা চলছে। উমা ভারতী মাইক হাতে চিৎকার করছেন। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠছে জয় শ্রীরাম। শ্লোগান উঠছে, "অন্দর কি এবাত হ্যায়, পুলিশ হামারা সাথ হ্যায়।" আগেই বলেছি রাইফেলধারীরা নীরব দর্শক। এখন দেখা গেল, পুলিশ শুধু করসেবার সময় নীরব দর্শক সেজেই বসে ছিলেন না। তাঁরাও রাইফেল রেখে চিৎকার করছিলেন জয় শ্রীরাম বলে। দমকলের গাড়ী নিয়ে আসা হল মসজিদের কাছে। কিন্তু দমকলের গাড়ী মসজিদ রক্ষার কাজে না লেগে মসজিদ ভাঙ্গার সহযোগী হয়ে গেল। দমকলের হোস পাইপ করসেবকদের মই-এর কাজে ব্যবহৃত হল। ২টো ৪০ মিনিটে নিশ্চিহ্ন হল উত্তর দিকের অর্থাৎ সরযু নদীর দিকের গম্বুজটা। তারপর দক্ষিণ দিকেরটা নিশ্চিহ্ন হল ৩টে ৩০ মিনিটে। মাঝের গম্বুজটা নিশ্চিহ্ন হল বৈকাল ৪টে ৪৬ মিনিটে। মাইকে আওয়াজ উঠলো সাংসদ বিনয় কাটিয়ারের কণ্ঠে—হিন্দু রাষ্ট্র জিন্দাবাদ, জয় শ্রীরাম। মসজিদ ধ্বংস যখন প্রায় শেষের দিকে তখন মসজিদের ভিতর থেকে রামলালার মূর্তি আর প্রনামীর বাক্স বার করে নেওয়া হল।

সংখ্যালঘু আক্রমন ঃ অযোধ্যা থেকে ফৈজাবাদের পথে গরীব মুসলমানদের বাস। বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার পর উন্মত্ত রাম ভক্তরা তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। গরীব মুসলমানদের রুটি-রুজির উপকরণ রিক্সা-অটো রিক্সায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

আদালতকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বাবরী মসজিদ ধ্বংস হচ্ছে অযোধ্যায় এদিকে কার্ফু জারী হয়ে গেল ফৈজাবাদে। মিলিটারী টহল শুরু হল ফৈজাবাদে। কেন্দ্র কল্যান সিং সরকারকে বরখাস্ত করল।

রাম মন্দির নির্মান ঃ- সারা রাত ধরে চলল মসজিদের ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ। ভোর সাড়ে চারটে। সাংসদ বিনয় কাটিয়ার বললেন, যাঁরা রাজমিস্ত্রির কাজ জানেন, এগিয়ে আসুন। মসজিদ স্থলে মন্দির তৈরী হবে। ইঁট, বালি, সিমেণ্ট আগেই জড়ো করে রাখা ছিল।

২৫ ফুট লম্বা ২০ফুট চওড়া ১০ফুট উঁচু রাম মন্দির তৈরী হয়ে গেল। মন্দিরের নির্লজ্জ বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ ত্রিশুল প্রোথিত হল। আগেই বলেছি রাম লালার মূর্তি মসজিদের ভিতর থেকে রাত্রে বের করে নেওয়া হয়েছিল। ঐ মুর্তি এনে বসিয়ে দেওয়া হল নবনির্মিত এই মন্দিরের মধ্যে। বাবরী মসজিদের ধ্বংসের কাজ শুরু করা হয়েছিল উত্তর প্রদেশে কল্যাণ সিং-এর রাজত্বে আর নতুন মন্দির তৈরী হল রাষ্ট্রপতি শাসনে। ৬ই ডিসেম্বর শুরু হয় মসজিদ ধ্বংসের কাজ। ৭ই ডিসেম্বর সারা দিন সারারাত ধরে রাষ্ট্রপতি শাসন চলাকালীন তৈরী হল রাম মন্দির। ৮ই ডিসেম্বর ভোর সাড়ে তিনটের সময় র‍্যাপিড এ্যাকসন ফোর্সের ১০৮ নং ব্যাটেলিয়ান এসে পৌছালো অযোধ্যায়। শুরু করলো এ্যাকশান। আধ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে দখল নিল অযোধ্যার এবং মসজিদ চত্বরের। কিন্তু হায় ! ততক্ষণে সবশেষ।

প্রশ্ন তুললে তো এই প্রসঙ্গে হাদার প্রশ্ন তো তোলা যায়। কিন্তু সব প্রশ্ন হজম করেও যে প্রশ্নটা না তুললেই নয়, সেটা হল—৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার আগেই অযোধ্যা থেকে ৭ কিমি দূরে ফৈজাবাদে মিনিটারী পৌঁছে গেল অথচ ফৈজাবাদ থেকে ৭ কিমি দূরে অযোধ্যায় মিলিটারী যেতে সময় লাগল ৮ই ডিসেম্বর ভোর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ? কেন ?

উপসংহার

সংঘ পরিবারের মুখপাত্র সাপ্তাহিক অর্গানাইজার পত্রিকায় বলা হয়েছে—"হিন্দু ধর্ম হলো বিশ্বাসের বস্তু, প্রমাণের নয়। বিশ্বাসের জোরেই খ্রীষ্টানরা যীশু খ্রীষ্টকে ভগবানের পুত্র বলে গ্রহন করেন, বিশ্বাস এবং একমাত্র বিশ্বাসের জোরেই মুসলমানরা মনে করেন মহম্মদ আল্লাহর পয়গম্বর। এই বিশ্বাসের বলেই হিন্দুরা মনে করেন অযোধ্যার রাম জন্মভূমিই ভগবান রামের জন্মস্থান।" কতবড় পাগলামি আর মিথ্যার ফুলঝুড়ি। মুসলমানরা কি অন্ধবিশ্বাসের জোরে মহাম্মদ (সঃ) কে পয়গম্বর বলে মনে করে ? মহাম্মদ (সঃ) সশরীরে উপস্থিত থেকে পযগম্বরী করেছেন এটা প্রমানিত সত্য। এখানে অন্ধ বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। অথচ কোন প্রমানের তোয়াক্কা না করে বাবরী মসজিদই

ভগবান রামের জন্মস্থান বলে দাবী করাকে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের সাথে তুলনা করে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা পাগলামি আর সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কি ? অবশেষে বলি ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। 'কাবা' ঘরকে পৌত্তলিকরা একদিন ৩৬০টি ঠাকুরের মন্দিরে পরিণত করেছিল। সেখানে আজ একটাও মূর্তি নাই। যারা কাবা ঘরে ৩৬০টি মুর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল তারাই বা তাদের বংশধরেরাই কাবা ঘরকে মুর্তি শূন্য করেছে। সুতরাং ঘাবড়াবো কেন ? আল্লাহ্ সব পারেন। তবে আমাদেরকে ভাবতে হবে। ১৯৯০ সালের ২৭শে জানুয়ারী প্রয়াগের মাঘী মেলার সময় বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতা মিঃ অশোক সিংহল মহাশয় জানিয়েছিলেন "পাঁচশিকে মূল্যের রাম শিলার কুপন বিক্রি করে পাওয়া গেছে ৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।" এটা সতঃস্ফুর্ত উদ্দ্যোগ আর আকাঙ্খার একটা নমুনা। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আদালত অবমাননা নয়, গায়ের জোর বা সন্ত্রাসের পথ নয়, আলোচনার টেবিলতো নয়ই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আদালতের চূড়ান্ত রায় বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। অযোধ্যার বাবরী মসিজিদ নিয়ে বিভিন্ন আদালতে এপর্যন্ত মোট ৭১টি মামলা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত । সুপ্রীম কোর্টই এদেশে শেষ এবং নিরপেক্ষ কথা বলার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আমরা ন্যায় ও সত্যের উপর আছি,
আল্লাহ্ আছেন আমাদের সাথে।

—সমাপ্ত—

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

এটি একটি তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক। এই পুস্তক লিখতে গিয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত ও অভিমত গ্রহন করা হয়েছে। বহু পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা থেকে গ্রন্থকার, প্রবন্ধক ও সাংবাদিক বন্ধুদের মতামত ও লেখার অংশ বিশেষ গ্রহন করা হয়েছে। তাঁদের সবার কাছে আমার ঋণ স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা জানাই।

—বিনীত গ্রন্থকার

বাবরী মসজিদ ধ্বংসোত্তর ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক বাবরী মসজিদ এবং তার সংলগ্ন ও অধীনস্থ যাবতীয় সম্পত্তি অধিগ্রহণ। ১৯৯৩ সালের ৩রা এপ্রিল দিল্লির পার্লামেন্টে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি বিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক পাশ করোনো হয়।

Act টি নীচের ছেপে দেওয়া হইল।

THE GEZETTE OF INDIA

The acquisition of certain area at Ayodhya
Act 1993

No. 33 of 1993 Dated 3rd April 1993

An Act to provide for the acquisition of certain area at Ayodhya and for matters connected there with or incidental thereto.

Whereas there has been a long standing dispute relating to the structure (including the premises of the inner and outer courtyards of such structure). Commonly known as the Ram Janma Bhumi-Babri Masjid, situated in village Kot Ramchandra in Ayodhya, in Pargana Haveil avadh, in tahsil Faizabad sadar, in the district of Faizabad of the state of Uttar Pradesh.

And whereas the said dispute has affected the maintenance of public order & harmony between different communities in the country.

And whereas it is necessary to maintain public order and to promote communal harmony and the sprit of common brotherhood amongst the people of India.

And whereas with a view to achieving the aforesaid objectives it is necessary to acquire certain areas in Ayodhya.

Be it enacted by parliament in the forty fourth year of the Republic of India as follows :—

Act এর Chapter গুলি পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির কারণে ছাপানো হইল না।

Contents

Act No. 33 of 1993 Dated 03/04/93 অনুযায়ী অধিগৃহীত সম্পত্তির তালিকা ঃ—

THE SCHEDULE

[See section 2 (a)]

Description of the Area

Sl. No.	Name of vill/ Revenue/Pargana / Tahsil/ District /State	Plot Nos	Area to be acquird Bigha	Biswa	Biswanis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Village Kot Ram Candra. Pargana Haveli Avadh ; Tehsil Faizabad Sadar, District Faizabad Uttar Pradesh	143	0	9	0
		144	0	7	0
		145	0	8	0
		146	1	6	7
		147	5	8	0
		158	0	4	0
		159	0	13	8
		160	5	13	0
		161	0	7	0
		162	1	8	7
		168	1	2	0
		169	1	7	0
		170	0	8	0
		171	1	7	0
		172	2	7	0
		173	0	18	0
		174	0	3	0
		175	0	6	0
		176	1	2	0
		177	0	16	0
		178	0	10	0

1)	2)	3)	4)	5)	6)
		179	0	14	0
		180	0	14	5
		181	0	13	10
		182	0	7	5
		183	0	7	5
		184	0	6	0
		185	0	7	5
		186	0	6	10
		187	0	7	0
		188	0	18	15
		189	0	14	0
		190	0	4	0
		191	4	6	14
		192	0	7	0
		193	0	12	0
		194	4	19	.0
		195	0	5	0
		196	0	5	0
		197	0	5	0
	Bounded by plot to 222 b on South plot No. 205 on West and plot No. 231 on East.	198	0	3	0
		199	0	12	0
		200	2	0	0
		204	0	3	0
		205	0	10	0
		206	0	5	0
		207	0	19	0
		208	0	5	0
		209	1	11	0
		210	0	18	0
		211	0	13	0
		212	0	4	14
		213	1	19	15

Contents

1)	2)	3)	4)	5)	6)
		214	0	6	0
		215	0	2	5
		216	0	6	0
		217	0	11	0
		218	0	3	0
		219	1	6	5
		220	0	12	0
		221	1	2	15
		222	0	5	7
		223	5	6	0
		224	1	0	0
		225	0	11	15
		226	0	10	5
		227	0	7	5
		228	0	5	0
		229	0	11	10
		230	0	2	10
		231	1	1	10
		232	0	2	0
		233	0	2	0
	Bounded on the North Partly plot No. 240 and partly by plot No. 243, on the west partly.	234	1	12	0
		235	0	10	0
		236	0	4	0
		237	0	1	0
	By plot No. 239 and partly by plot no 240 and on the south by plot No. 246.	238	1	6	0
		239	2	1	0
		244	0	14	10
			(Part)		
	Bounded by plot No. 238 on the South. Plot No 239 on the West and plot No 244 on the North.	246	0	18	0
		(Part)	75	14	7

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এর আরও দুটি অধ্যায় ছাপানো সম্ভব হচ্ছে না। দিল্লী সরকারের অধিগ্রহণ বলে বাবরী মসজিদ এবং তার যাবতীয় সম্পত্তি, এখন মসজিদেরও নয়। এ সম্পত্তির মালিক এখন দিল্লির সরকার। কিন্তু কি চমৎকার ব্যবস্থা দেখুন। ধ্বংসকৃত মসজিদের স্থানে, আজও নামাজ পড়া বন্ধ হলেও পুজো কিন্তু বন্ধ হয়নি। মারহাবা দিল্লির সরকার! মারহাবা তোমার নীতিকে! বাবরী মসজিদ ধ্বংসোত্তর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ইং ১৯৯৪ সালের ২৪শে অক্টোবর সুপ্রীম কোর্টের একটি অদেশ। এই আদেশের সম্পূর্ণ কপি এখানে ছেপে দিতে গেলে কমপক্ষে ২৫ পৃষ্ঠা লাগবে। সুতরাং এটাও সম্পূর্ণ না ছেপে এর থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট এখানে ছেপে দিচ্ছি। যার থেকে সহজেই অনুমান করা যাবে যে বাবরী মোকর্দ্দমায় আদালতের চূড়ান্ত রায় মসজিদের পক্ষে যাবেই ইনশাআল্লাহ্। এই আদেশে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট যা বলেছে তা অত্যন্ত আনন্দের এবং বাক্যগুলি অত্যন্ত মজার। কিন্তু কি করি? পাঠক/পাঠিকা বন্ধুরা, স্থানাভাবে এখানে সুপ্রীম কোর্টের এই আনন্দদায়ক এবং মজাদার কথাগুলি ছেপে দিতে পারছি না। হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি, কারণ কথাগুলি এতই মজাদার যে একবার পড়লে বার বার পড়তে ইচ্ছা হত আপনাদের।

THE POINTS :

1. The worship of the idol is now begining performed only by a priest, without access to the public, as allowed before 6th Dec...... 1992.

2. Puja of the Idols which started on 6th Dec.1992 was interrupted on 23rd Oct. 1994.

3. The worship of the idols in the interim orders of Court was to continue for indefinite period, now the idols will have to be removed if Muslims win the case.

4. If Muslims win the case, then they get back not only Babri Masjid Ayodhya site, but also Manas Bhawan & Sita-Ki-Rasoi sites.

5. Muslims now have the right of worship at the Babari Masjid site, it is up to them to exercise this right or not.

6. The transfer of property is to be made only after true

owner is found out by the courts.

7. The Central Government is acting only as a receiver and is committed to rebuild Babari Masjid Ayodha.

8. The questions whether a Hindu temple or any Hindu religious structure existed prior to the construction of Babari Masjid, is super lous and unnecessary.

9. All the pending suits and legal proceedings revised are to be processed with and decided in accordance with law, and not in accordance with faith.

10. Only title to Babari Masjid Ayodhya site to be adjudicated in the site, and not the Janmasthan of mythical epic lord Rama.

বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত সুপ্রীম কোর্টের এই ঐতিহাসিক আদেশই বলে দিচ্ছে এই মোকার্দ্দমায় মসজিদ পক্ষ জিতবেই ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু কোর্টের চূড়ান্ত রায় কবে বেরোবে? আদৌ কোনদিন বেরোবে কি? যদি বেরোয় এবং যদি সেই আদেশ স্বাভাবিক কারণেই মুসলমানদের বা মসজিদের পক্ষে যায় তা হলে কি হবে? আর যদি কোন দিনই এই ঐতিহাসকি মোকার্দ্দমার রায় না বেরোয় তাহলে কি ঐ স্থানে আর কোন দিনই মসজিদ দেখতে পাব না আমরা? এসব প্রশ্নের জবাব আমি বিভিন্ন জালসা এবং ধর্মসভায় বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বহুবার দিয়েছি। প্রিয় পাঠক/পাঠিকা বন্ধুরা নিশ্চই অবগত আছেন, কোন একটা বিষয় মাতৃ ভাষায় মনের মত করে সহজ ও সরলভাবে যত সহজে মানুষকে বুঝিয়ে বলা যায়, লিখে ঠিক সেইভাবে বোঝানো যায়না আর গেলেও তা অত্যন্ত কঠিন এবং তার জন্য অনেক বেশী লেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যা এখানে সম্ভব হলো না এখানে এই বিষয়ের উপর লেখার পরিমাণ খুব কম রাখা হয়েছে। সুতরাং এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পুস্তকের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি না করে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে চলে যাবার আগে, মিল্লাতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই আল্লাহ ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ যারা বাবরী মসজিদ ভাঙার কাজে যুক্ত ছিল তাদের নিষ্ঠুর পরিণতিই তার প্রমাণ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন "ওয়া খাইরুন উকবা" অর্থাৎ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র বাবরী মসজিদ ধ্বংসের কাজে যারা যুক্ত ছিল এ রকম ৩৭ (সাঁইত্রিশ) জন আল্লাহ্ এর গজবে চিরদিনের মত অন্ধ হয়ে গেছে। তাদের বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

দিল্লীর আনসারী এক্সপ্রেসের খবর (রেনেসাঁ হইতে)

বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীরা অন্ধ হচ্ছে

অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ধংসে অংশগ্রহণকারী করসেবক নামে উগ্র হিন্দুদের চোখ অন্ধ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৩১ জন করসেবক অন্ধ হয়েছে এবং আরো কয়েকশো অন্ধ হওয়ার পর্যায়ে। তাদের মধ্যে মহামারীর ন্যায় অন্ধ হওয়ার পর্যায়ে। গুজব ছড়িয়ে পড়ায় রামমন্দির নির্মাণের নেতাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের নেতারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। দিল্লী থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আনসারী এক্সপ্রেস' এর সংবাদ উদ্ধৃতি দিয়ে ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক এ সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বিগত ৬ই ডিসেম্বর ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার ন্যাক্কারজনক কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত করসেবক বাহিনীতে কয়েকটি দল বিহারের ছাপরা শহর এবং উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর ও গোরখপুর জেলা থেকেও অংশ নিয়েছিল। দক্ষিণ ভারত থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক করসেবক এ কুখ্যাত কাজে যোগ দেওয়ার জন্য অযোধ্যায় এসেছিল। কিন্তু তারা বাবরী মসজিদ ধ্বংসে তেমন তৎপর ছিল না। পরিকল্পিত পন্থায় যে সব করসেবক বাবরী মসজিদ শহীদ করার কাজে তৎপর ছিল তাদের মধ্যে ৩১ জন বিহার প্রদেশের বাসিন্দা। ঐ প্রতিবেদনে আরও বলা হয় আল্লাহর পবিত্র ঘর ভাঙবার শাস্তি স্বরূপ এ পর্যন্ত ছাপরা শহরে দাহিয়ান মহল্লার ১৭জন, উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর জেলায় ৯ জন, গোরখপুরের ৫ জন তাদের চোখের জ্যোতি হারিয়ে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়ে গেছে। এসব করসেবক ৯ই ডিসেম্বর অযোধ্যা থেকে তাদের নিজ বাসস্থানে ফিরে আসে।

কয়েকদিন পর রাতে চোখে ব্যাথা অনুভব করতে থাকে। বিহারে সারেন জেলার ছাপরা শহরে ১৭ জন করসেবক যারা একই দাহিয়ান মহল্লার লোক ছিল তারা পর দিন ডাক্তারের নিকট এসে চোখের ব্যাথার কথা বললে ডাক্তার তাদের চোখ দেখে তা 'সামান্য ব্যাপার' বলে সান্তনা এবং সামান্য ঔষধ দিয়ে তাদের বিদায় করেন। কিন্তু তাতে তাদের চক্ষু যন্ত্রণা প্রশমিত না হয়ে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এরপর অভিভাবকরা তাদের পাটনায় এনে চক্ষু বিষেজ্ঞদের দেখালেন। অত্যাধুনিক যন্ত্র দিয়ে তাদের চক্ষু পরীক্ষা করা হল, ব্যথা প্রশমনকারী ঔষুধও প্রয়োগ করা হল কিন্তু এক সপ্তাহ পর ঐ চক্ষু যন্ত্রণা অন্যরূপ ধারণ করে। উক্ত ১৭ জন করসেবকই ডাক্তারদের নিকট অভিযোগ করে যে, তাদের

চোখে এখন আর ব্যথা নেই। কিন্তু তারা কেউই আর দেখতে পাচ্ছে না। তাদের চোখের জ্যোতি চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে।

ডাক্তারগণ পুণরায় তাদের পরীক্ষা করলেন। কিন্তু তাদের বোধগম্য হচ্ছে না চোখের দৃষ্টি কোন কারণে নষ্ট হল? প্রকাশ্যভাবে উন্নতমানের পরীক্ষা নিরীক্ষার সত্ত্বেও চোখের জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে চলে যাওয়ার কারণ বুঝতে না পারায় চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ হতভম্ব হয়ে গেলেন। বিহারের ছাপরা শহরের যেসব করসেবক চোখ হারিয়েছে তাদের নাম হচ্ছে - কৃপা শংকর, অনন্ত প্রসাদ, সুশীল প্রসাদ, রাজেন্দ্র গুপ্ত, মিতনেস কুমার, যতীন্দ্রকুমার, সুভাষ সিংহ, নন্দকুমার সিংহ, অজিত কুমার সিংহ, শুভারাম শর্মা, কৃষ্ণকান্ত ওঝা, জনার্দন তেওয়ারী, কৃপা রাম, অজয় পাণ্ডে এবং গোপাল পাণ্ডে। ঐ সব করসেবক একই মহল্লার বাসিন্দা। তারা মুলায়ম সিং যাদব ক্ষমতাসীন থাকাকালে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অযোধ্যায় এসেছিল। এদের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর জেলার ৯জন, গোরখপুর জেলার ৫ জন করসেবকেরও চোখের জ্যোতি অন্ধ হয়ে গেছে। যমুনা রাম ও সত্যরাম নামক পাপিষ্ঠদ্বয় চোখের জ্যোতি হারিয়ে অত্যন্ত অনুতপ্ত। তারা কান্নাকাটি করছে আর বলছে আমরা অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভেঙেছি, তাই ভগবান অসন্তুষ্ট হয়েছে। তারা অনুভব করতে পারছে যে, ধর্মের পবিত্র স্থানের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করার শাস্তি এ ধরণের মারাত্মক হয়ে থাকে যা তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে। এসব এলাকার জনগণের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা যে, এসব লোক মসজিদ ভাঙার মত ঘৃণ্য কাজে অংশ নিয়েছে বলে এমন জঘন্য অভিশাপের শিকার। আর মহিলা ও হিন্দু পুরোহিতদের মত হচ্ছে লোকদেরকে পাপ স্পর্শ করেছে।

প্রিয় পাঠক / পাঠিকা বন্ধুরা কি শুনে চমকে উঠবেন না যে, এই জঘন্য, পৃথিবীর ইতিহাসের নিকৃষ্টতম বর্বর অপকর্মে শুধু অমুসলমানরা নয় কিছু মুসলমান নামধারী বেইমানও যুক্ত ছিল। এখানে স্থানাভাবে তাদের নাম, ঠিকানা এবং পরিণতির কথা লেখা সম্ভব হয়ে উঠল না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন "হুয়া খাইরুন সওয়া বাঁও" অর্থাৎ আল্লাহ উত্তম বা শ্রেষ্ঠ প্রতিদান বা পুরস্কার প্রদানকারী। সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির তাগিদে আল্লাহ-র ঘর ঐ বাবরী মসজিদকে পুনরায় পূর্বের স্থানে পুনঃ নির্মানের মহত কাজে জান মাল দিয়ে মুজাহিদার জন্য আমরা তৈরী থাকব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন আমীন।

Contents

লেখকের অন্যান্য পুস্তক ঃ

১। বাঁচার ডাক
২। রাম ভক্তিতে কে বড়?
৩। জবাব-১ম খণ্ড
৪। জবাব-২য় খণ্ড
৫। জবাব-৩য় খণ্ড
৬। চূড়ান্ত জবাব
৭। হাতিয়ার
৮। ইসলাম কি ও মুসলমান কে ?
৯। কাদিয়ানী জাল
১০। রক্তাক্ত কাশ্মীর
১১। পাকিস্থানের গুপ্তচর
১২। নারীর দাবী
১৩। ঝড়
১৪। আগুন দিয়ে লিখছি
১৫। রক্তের ঢেউ
১৬। বজ্র কণ্ঠে আহ্বান
১৭। কঙ্কাল
১৮। উলঙ্গ
১৯। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র
২০। গণতন্ত্রের জনক ইসলাম
২১। সভ্য সমাজে সন্ত্রাস নয় গণতন্ত্রই সঠিক পথ
২২। স্রষ্টার বিধান বনাম সৃষ্টির বিধান
২৩। বিশ্ব বনাম লাদেন
২৪। সাধু বনাম শয়তান

ফোন ঃ-
বাড়ী ঃ- 0342 - 2713-253
কাছে থাকে ঃ- 9732048960
অফিস ঃ- 03523 - 277686

প্রাপ্তিস্থান ঃ
ইসলামিয়া লাইব্রেরী
৩৮ মদন মোহন বর্মন ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৭
ফোন-(০৩৩)২৩৩১৯৬৭